আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

সপ্তম শ্রেণি

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রফেসর ফাতেমা চৌধুরী
ড. সরকার আবদুল মান্নান
জিয়াউল হাসান
নুরুন নাহার
মতিউর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে সহপাঠ্যপুস্তক প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমরা জানি, জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থাকে গতিশীল, জীবনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ধারাবাহিক সংস্কার ও নবায়ন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির বাংলা সহপাঠ্যপুস্তক 'আনন্দপাঠ' নামে সংস্কার ও নবায়ন করা হয়েছে। এ নবায়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভালো লাগা, আনন্দলাভ ও জ্ঞানার্জনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গেও নানাসূত্রে যেন তাদের পরিচয় ঘটে, সে দিকটিও বিবেচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে বিশ্বসাহিত্য থেকে আটটি কাহিনি সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিরায়ত জীবন, সত্য ও সৌন্দর্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না সে দিকটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাষাগত সহজ, সাবলীলতা ও গতিশীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১.	তোতাকাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১-৬
২.	গুরুচণ্ডালী	শিবরাম চক্রবর্তী	৭-১২
৩.	বুলু	অজিত কুমার গুহ	১৩-১৮
৪.	মানুষের মন	বনফুল	১৯-২৪
৫.	আদুভাই	আবুল মনসুর আহমদ	২৫-৩৩
৬.	অলক্ষুণে জুতো	মোহাম্মদ নাসির আলী	৩৪-৪০
৭.	উনিশ শ একাত্তর	ইমদাদুল হক মিলন	৪১-৪৯
৮.	বিচার নেই	আমীরুল ইসলাম	৫০-৫৩
৯.	চরু	হাসান আজিজুল হক	৫৪-৫৮

তোতাকাহিনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

এক-যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর পড়িল পাখিকে শিক্ষা দিবার দায়িত্ব।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে-বাসা বাঁধে সে-বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বত প্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল, সেই বলিল, 'সাবাস। বিদ্যা আর ধরে না।'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইয়া বলদ বোঝাই করিয়া তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা-পালিশ করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো, খুড়তুতো, মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলি খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনই ভাগিনাদের গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র-মিত্র-অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া-নাকাড়া তুরী ভেরী দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসের খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো, পিসতুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন!'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ঐ যা। মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চিৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরের রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতেই চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কানমলা দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুরমতো আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝটপট করে। এমন-কি, এক-একদিনে দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'এ কী বেয়াদবি।'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি। লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোনকালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কি কথা শুনি।'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কী আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হুঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

লেখক-পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (৭ই মে ১৮৬১ সাল) কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ তিনি করেননি, কিন্তু সাহিত্যের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর। বাল্যকালেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তাঁর

'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সুরকার, নাট্য প্রযোজক, অভিনেতা ছিলেন। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি সাহিত্যের সব শাখায় তিনি সমানভাবে পদচারণ করেছেন। তাঁর অনেক রচনার মধ্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা,' 'ক্ষণিকা', 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'রক্ত করবী', 'গল্পগুচ্ছ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ই আগস্ট, ১৯৪১) এই মহান কবি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সার-সংক্ষেপ

একটি পাখিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। রাজার নিকটাত্মীয়রা এ দায়িত্ব পেল। পন্ডিতেরা অনেক বিচার-বিবেচনা করে বললেন,পাখিদের বাসা ছোট এবং খড়কুটার তৈরি, তাই এতে বিদ্যা ধরে না। তাই খাঁচা বানানোর পরামর্শ দিয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে গেলেন। স্যাকরা সোনার খাঁচা তৈরি করে দিয়ে থলি বোঝাই বখশিশ নিয়ে গেল। পন্ডিতেরা পাখিটাকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য লেগে গেলেন। তাঁরা আরও পুঁথি লিখিয়ে নিলেন। লিপিকররা পারিতোষিক নিয়ে চলে গেলেন। খাঁচা তৈরি ও অন্যান্য কাজে অনেক লোক লাগল। পাখিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশাল আয়োজন চলতে লাগল। রাজা মাঝে মাঝে খোঁজ নিলেও নিজের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে ভুল বুঝিয়ে আসল সত্য লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছে, যারা সত্য প্রকাশ করে দেয়। একদিন রাজার ভুল ভাঙে। তত দিনে পাখিটা মারা যায়। রাজার ভাগিনারা বলে, "পাখিটার শিক্ষা পুরা হয়েছে।"

শব্দার্থ

তনখা-বেতন; টাকা; মুদ্রা। স্যাকরা—স্বর্ণকার; সোনারু। ঢাক—সুপরিচিত বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র, ঢক্কা। তুরী-বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; রণশিঙ্গা; বিউগল। দামামা—ঢাক জাতীয় রণবাদ্য।তলব করা —ডেকে পাঠানো। লোকসান-ক্ষতি; অর্থনাশ; অর্থহানি; অপচয়। কাড়া-নাকাড়া—ঢাক জাতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। অবিদ্যা—অজ্ঞান; মায়া। (অবিদ্যা পাঁচ প্রকারের, যথা—তম; মোহ; মোহামোহ; তামিস্র এবং অন্ধতামিস্র)। দক্ষিণা—হিন্দুসমাজে ক্রিয়াকর্মের শেষে পুরোহিত, গুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেওয়া অর্থ বা পারিশ্রমিক। বখশিশ—পুরস্কার; ইনাম; পারিতোষিক। লিপিকর—যাঁরা পুঁথি লেখে; লেখক; নকলনবিশ। খবরদারি—তত্ত্বাবধান। অমাত্য—মন্ত্রী; মন্ত্রণাদাতা। দেউড়ি—বাড়ির প্রধান প্রবেশদ্বার; সদর দরজা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রাজা কাকে শিরোপা দিলেন?
ক. মন্ত্রী খ. কোতোয়াল
গ. ভাগিনা ঘ. রাজপণ্ডিত

২. পণ্ডিতদের মতে পাখি'র অবিদ্যার কারণ হলো–
ক. বাসা জীর্ণ ও সংকীর্ণ খ. শাস্ত্র পড়তে না পারা
গ. কায়দাকানুন না জানা ঘ. রাজ দরবারের অবহেলা

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রূপমের বাবা অফিসের কাজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। রূপমের চঞ্চলতা ও দুরন্তপনা কমানোর জন্য মা স্কুল, কোচিং ও ধর্মীয় শিক্ষকের পাশাপাশি বাসায় নাচ, গান ও আর্টের শিক্ষক নিয়োগ করেন। রূপমের লেখাপড়ার এতসব আয়োজনের খবর শুনে বাবা খুশি হন এবং স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে থাকেন। আস্তে আস্তে রূপমের চঞ্চলতা কমতে থাকে, শরীর খারাপ হয়, খাবার খেতে চায় না এবং চূড়ান্তভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৩. রূপমের বাবার চরিত্রের সাথে 'তোতা কাহিনী' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক. স্ত্রী খ. রাজা
গ. মাসতুতো ভাই ঘ. পুঁথিলেখক

৪. 'তোতা কাহিনী' গল্পের কোন বিষয়টি রূপমের শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ার ইঙ্গিতবাহী?
ক. মাত্রাতিরিক্ত শাসন খ. শিক্ষার নামে অতি আয়োজন
গ. স্কুলের কঠোর নিয়ম-কানুন ঘ. শিক্ষার প্রতি আগ্রহ

সৃজনশীল প্রশ্ন

মনির সাহেবের একমাত্র সন্তান অমিত। সে প্রচণ্ড অলস, অকর্মণ্য পড়াশোনায় মনোযোগ নেই। কিন্তু বাবার ইচ্ছা ছেলেকে উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। ছেলেকে বিদ্যা শেখানোর জন্য অনেক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলো, অসংখ্য বই-পত্র, দিস্তা দিস্তা কাগজ-কলম এনে জড়ো করা হলো। নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হলো। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়ি কেনা হলো। সবাই মনির সাহেবের প্রশংসা করতে লাগলো।

ক. রাজা নিন্দুককে কী দিতে বলে দিলেন?
খ. 'পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে'– একথা কেন বলা হয়েছে?
গ. 'তোতা কাহিনী' গল্পের কোন দিকটি মনির সাহেবের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষা নিয়ে বাড়াবাড়ির দিকটি 'তোতা কাহিনী'গল্পের আলোকে মূল্যায়ন কর।

গুরুচণ্ডালী

শিবরাম চক্রবর্তী

সীতানাথবাবু ছিলেন সেকেণ্ড পণ্ডিত, বাংলা পড়াতেন। ভাষার দিকে তাঁর দৃষ্টি একটুও ভাসা-ভাসা ছিল না—ছিল বেশ প্রখর। ছেলেদের লেখার মধ্যে গুরুচণ্ডালী তিনি মোটেই সইতে পারতেন না।

সপ্তাহের একটা ঘণ্টা ছিল ছেলেদের রচনার জন্য বাঁধা। ছেলেরা বাড়ি থেকে রচনা লিখে আনত— একেক সময়ে ক্লাসে বসেও লিখত। সীতানাথবাবু সেইসব রচনা পড়তেন, পড়ে পড়ে আগুন হতেন। ছাত্রদের সেই রচনা পরীক্ষা করা, সীতার অগ্নিপরীক্ষার মতোই একটা উত্তপ্ত ব্যাপার ছিল সীতানাথবাবুর কাছে। যেমন তাঁর তেমনি আমাদেরও। এত করে বকেঝকেও গুরুচণ্ডালী দোষ যে কাকে বলে ছাত্রদের তিনি তা বুঝিয়ে উঠতে পারেননি—উক্ত দোষমুক্ত করা তো দূরে থাক।

সেদিনও তিনি ক্লাসসুদ্ধ ছেলের রচনা খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠল, হাতের দু-রঙা পেনসিলের লাল দিকটা ঘসঘস করে চলতে লাগল খাতার ওপর— রচনার লাইনগুলো ফসফস করে লাল দাগে কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এর চেয়ে ছেলেদের চাবুকে লাল করা যেন

সোজা অনেক—ছিল ঢের আরামের—আর তা করতে পারলে যেন গায়ের ঝাল মিটত তাঁর। খাতাগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি বললেন—'এ আর কী দেখব! খালি গুরুচণ্ডালী। কতবার করে বলেছি, হয় সাধুভাষায় লেখো, নয়তো কথ্যভাষায়। যেটাতেই লেখো তা ঠিক হবে। কিন্তু একরকমের হওয়া চাই। সাধুভাষায় আর কথ্যভাষায় মিশিয়ে খিচুড়ি পাকানো চলবে না। না, কিছুতেই না। কিন্তু এখনো দেখছি সেই খিচুড়ি—সেই জগাখিচুড়ি।'

গণেশ বললে—'আমি সাধুভাষায় লিখেছি স্যার।'

'সাধুভাষায় লিখেছ? এই তোমার সাধু সাধুভাষা?' সীতানাথবাবু গাদার ভেতর থেকে তার খাতাটা উৎখাত করেন—'কী হয়েছে এ ? 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল'?'

'দুগ্ধফেননিভের সঙ্গো—'কেন স্যার, 'করিয়া' তো দিয়েছি আমি। করিয়া কি সাধুভাষা হয়নি স্যার?'

'কিন্তু ধপাস? ধপাস কী ভাষা? দুগ্ধফেননিভের পরেই এই ধপাস?'

গণেশ এবার ফেননিভের মতোই নিভে যায়, টুঁ শব্দটি করতে পারে না।

'কতবার বলেছি তোমাদের যে, ভাষায় খিচুড়ি পাকিয়ো না। হয় সাধুভাষায় নয় কথ্যভাষায়— যেটায় হয় একটাতে লেখো। কিন্তু দেখো, আগাগোড়া যেন একরকমের হয়। গণেশের এই বাক্যটিকে তোমাদের মধ্যে নিখুঁত করে বলতে পারো কেউ?'

'পারি স্যার।' মানস উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়িয়েই মাথা চুলকোতে লাগল সে। ধপাস-এর সাধুভাষা কী হবে তার জানা নেই। খানিক মাথা চুলকে আমতা-আমতা করে সে নিজেও ধপাস করে বসে পড়ল। তার মানসে যে কী ছিল তা জানা গেল না। সরিৎ উঠে বলল, 'কিসে বলব স্যার? কথ্যভাষায়, না অকথ্য ভাষায়?

'যাতে তোমার প্রাণ চায়।'

'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়েস করে বসল।'

'দুগ্ধফেননিভের সঙ্গো আয়েস?' সীতানাথবাবুর মুখখানা—উচ্ছের পায়েস খেলে যেমন হয় তেমনিধারা হয়ে ওঠে : 'ওহে বাপু! গুরুচণ্ডালী কাকে বলে তা কি তোমাদের মগজে ঢুকেছে? মনে করো যে, যে-চাঁড়ালটা আমাদের এই স্কুলে ঝাঁট দেয়, সে যদি হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গো একাসনে বসে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন লাগে? সেটা যেমন দৃষ্টিকটু দেখাবে, কতকগুলি সাধু শব্দের মধ্যে একটা অসাধু শব্দ ঢুকলে ঠিক সেই রকম খারাপ দেখায়, তাই না? সাধুভাষার শব্দ যে কথ্যভাষার শব্দের সঙ্গো এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে পারে না, সেই কথাই আবার অন্যান্য সাধু শব্দের সঙ্গো মিশ খেয়ে বেশ মানিয়ে যেতে পারে। যেমন উদাহরণস্বরূপ—'

'বলব স্যার? এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি।' বলে ওঠে গণেশ : 'দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আয়াস-সহকারে বসিল। কিম্বা উপবেশন করিল।— হয়েছে স্যার এবার?'

'কিংবা আরও বেশি সাধুতা করে আমরা বলতে পারি—' নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ায় : 'আসন গ্রহণ করিল। কিংবা আসন পরিগ্রহ করিল।'

দীপক বলে, 'সমাসীন হইল'ও বলা যায়।

'আবার তুই এর মধ্যে সমাস এনে ঢোকাচ্ছিস?' গণেশ তার কানের গোড়ায় ফিসফিস করে, 'এতেই কেঁদে কূল

পাইনে, এর ওপর ফের সমাস?'

'যেমন উদাহরণস্বরূপ—' সীতানাথবাবু বলতে থাকেন... কিন্তু তাঁর বলার মাঝখানেই পিরিয়ডের ঘণ্টা বেজে যায়। উদাহরণস্বরূপ প্রকাশের আগেই তাঁকে ক্লাস ছেড়ে যেতে হয়।

নিজের বক্তব্য আরেক দিনের জন্য রেখে সমস্ত প্রশ্নটাই আমূল মূলতবি করে যান।

দিনকয়েক পরে গণেশ রেশন আনতে গিয়ে দেখল যে, সেকেন্ড পণ্ডিত মশাইও সেই সরকারি দোকানে এসেছেন। লম্বা লাইনের ফাঁকে সীতানাথবাবুও দাঁড়িয়ে। সেই কিউয়ের ভেতর মহল্লার ঝাড়ুদার—নিশ্চয়ই সেখানে চণ্ডাল যেমন রয়েছে, তেমনি আছে পাড়ার গুণ্ডারা। তারাও কিছু সাধু নয়। গুরুতর লোক। তাদের প্রচণ্ডালই বলা যায় বরং। প্রচণ্ড তাদের দাপট। পাড়ার সার এবং অসার—সবাই এক সারের মধ্যে খাড়া। একেবারে সমান সমান। রীতিমতোই গুরুচণ্ডালী। সীতানাথবাবু ছিলেন সারির মাঝামাঝি। গণেশ অনেক পরে এসে শেষের দিকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সীতানাথবাবুকে। চণ্ডালদের মধ্যে গুরুদেব—ব্যাকরণ বিরুদ্ধ এই অভাবিত মিলনদৃশ্য দেখে সে অবাক হলো। সত্যি বলতে সে-দৃশ্য অবাক হয়ে দেখার মতোই।

সীতানাথবাবুর দৃষ্টি কোনোদিকে ছিল না। অজগরের মতো বিরাট লাইন যেন কচ্ছপের গতিতে এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে। কতক্ষণে রেশন নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন, হাঁড়ি চড়িয়ে চান সেরে নাকে-মুখে দুটি গুঁজে পাড়ি দেবেন স্কুলে, সেই ভাবনাতেই সমস্ত মন পড়েছিল তাঁর।

সহসা এক বালকসুলভ তীক্ষ্ণকণ্ঠ তাঁর কানে এসে পিন ফোটাল। ফুটতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন—'স্যার, স্যার! ব্যগ্র হোন কল্য।' 'ব্যগ্র হোন কল্য?' শুনতে পেলেন তিনি। শুনেই তিনি পিছন ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন গণেশকে। কিউয়ের শেষে দাঁড়িয়ে চিৎকার ছাড়ছে : 'ব্যগ্র হোন কল্য।'

তার মানে? কেন তিনি ব্যগ্র হবেন? আর হন যদিবা তো তা কালকে কেন? ব্যগ্র যদি হতেই হয় তো আজকেই কেন নয়? এই মুহূর্তেই বা নয় কেন? আর, এই মুহূর্তে ব্যগ্র হয়েই বা কী হবে? কিউয়ের লাইন তো আর ছেলেদের খাতার লাইন নয় যে পেনসিলের এক খোঁচায় ফ্যাঁশ করে কেটে এগিয়ে যাবেন! যত তাড়াই থাক, যতই ব্যগ্র হন, আগের লোকদের কাটিয়ে এগোনোর একটুও উপায় নেই এখানে। ফাঁড়ার মতোই অকাট্য এই লাইন। ফাঁড়ির মতোই ভয়াবহ।

'স্যার স্যার—পুনরায় ! পুনরায়! ব্যগ্র হোন কল্য! ব্যগ্র হোন কল্য!' আবার সেই আর্তনাদ। সীতানাথবাবুর ইচ্ছে করে এক্ষুণি গিয়ে বেশ একটু ব্যগ্রভাবেই গণেশের কান দুটো ধরে মলে দেন আচ্ছা করে। বেশ করে মলে দিয়ে বলেন, 'এই মললাম অদ্য। ফের মলব কল্য।' কিংবা তুলে ধরে এক আছাড় মারেন ওকে। কিন্তু ওকে পাকড়ানোর এই ব্যগ্রতা দেখাতে গিয়ে লাইনের জায়গা পা-ছাড়া করার কোনো মানে হয় না।

আস্তে আস্তে এগিয়ে দোকানের ভেতর পৌঁছে রেশনের দাম দিতে গিয়ে তাঁর চোখ কপালের কানায় ঠেকল — যেমন একটু আগে তাঁর কান চোখা হয়ে উঠেছিল। দেখেন যে তাঁর পকেট মারা গেছে। পকেটের যেখানে টাকার ব্যাগটা থাকে, সেখানটা ফাঁকা। বৃথা হইচই না করে বিমুখে তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

'স্যার, তখন আমি কী বলছিলাম? আমি অত করে বললাম, তা আপনি কানই দিলেন না। আদৌ কর্ণপাতই করলেন না!' গণেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দোকানের মুখে পৌঁছে মাস্টারের সম্মুখে পড়েছে। 'কী বলেছিলে তুমি? তুমি তো আমায় কাল ব্যগ্র হতে বলেছিলে? আর এদিকে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল!'

'কাল ব্যগ্র হতে বলেছি? মোটেই না। আমি বলেছিলাম আপনার 'ব্যগ্র গ্রহণ করল'। আপনার পরেই যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল, সে হতভাগাই পেছন থেকে আপনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে—'

'তা, 'পকেট মারল' বলতে তোর কী হয়েছিল রে হতমুখ্য?' সীতানাথবাবুর সমস্ত রাগ এখন গণেশের ওপর গিয়ে পড়ে : 'সোজাসুজি তা বললে কী হতো? তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো তোর? 'পকেট মারছে স্যার'—বলতে কী আটকাচ্ছিল তোমার পাপমুখে?'

'ছি ছি!'গণেশ নিজের জিভ কাটে—'অমন কথা বলবেন না স্যার! 'পকেট মারছে'—সে কথা কি আপনার সামনে উচ্চারণ করতে পারি? পকেট প্রহার করছে বললেও তো শুদ্ধ হয় না। আর বলুন, গুরুমশায়ের সামনে অমন চণ্ডালের মতন ভাষা কি বলতে আছে—বলা যায় কি? ও কথা-অমন কথা বলবেন না স্যার। ব্যগ্র গ্রহণ করল বলেছি—জানি যে, তাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়নি, গুরুচণ্ডালী একটুখানি যেন রয়ে গেছে; ভাবলাম, কতবার ভাবলাম, কিন্তু কী করব, ব্যাগের সাধুভাষা যে কী তা তো আমার জানা নেই স্যার। কিন্তু কিছুতেই ব্যাগের শুদ্ধটা মগজে এল না। এদিকে ভাবতে ভাবতে ব্যাগসুদ্ধ নিয়ে সে যে সটকাল !'

লেখক-পরিচিতি

শিবরাম চক্রবর্তী ১৩১০ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। তিনি মালদহের সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে পড়ালেখা করেন। তাঁর পেশা ছিল সাংবাদিকতা। তিনি গদ্য, পদ্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্য লেখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই : 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা', 'ভালোবাসা পৃথিবী ঈশ্বর' ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 'কিশোর রচনা সমগ্র'। তিনি ১৩৮৭ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র (২৮শে আগস্ট ১৯৮০) মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন সীতানাথবাবু। বাংলা রচনা লেখার সময় শিক্ষার্থীরা গুরুচণ্ডালী করলে তা তিনি মোটেও সহ্য করতেন না। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও গুরুচণ্ডালীদোষ কী তা ছাত্রদের বোঝাতে পারেননি। যে কোনো লেখার সময় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ যে গুরুচণ্ডালী, তা তিনি ছাত্রদের বারবার বলতেন এবং সেটি না করার জন্য তাগিদ দিতেন। কোথাও এতটুকু ত্রুটি পেলেই তিনি বকাঝকা করতেন। ফলে তারা ভয়ে ভয়ে থাকত। পারতপক্ষে তাঁর ধারে-কাছে আসত না।

একদিন গণেশ নামের একজন ছাত্র সরকারি রেশনের দোকানে এসে দেখল এক লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সীতানাথবাবু। সে দেখল যে এক পকেটমার স্যারের পকেট মেরে নিচ্ছে। গণেশ চিৎকার করে সাধুভাষায় বলে উঠে, 'স্যার স্যার! ব্যগ্র হোন কল্য! ব্যগ্র হোন কল্য।' ভাষা শুদ্ধ না-হওয়ায় পণ্ডিত মশাই কোনোকিছু বুঝতে পারেননি। যখন তিনি রেশনের দোকানে বিল পরিশোধ করতে গেলেন তখন দেখলেন যে তাঁর পকেট কাটা। ততক্ষণে গণেশ সামনে এসে বলল যে গুরু মশায়ের সামনে পকেট মারছে কথাটা উচ্চারণ করা যায় না বলে সে ওভাবে সাবধান করছিল। স্যার সেটা বুঝতে পারলেন না। এই ফাঁকে তাঁর পকেট মার গেল।

শব্দার্থ ও টীকা

গুরুচণ্ডালী– সাধুভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার ব্যবহাররূপ দোষ; সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশজ শব্দের মিশ্রণের অসঙ্গতি। **দুগ্ধফেননিভ**– দুধের ফেনার মতো সাদা ও কোমল। **আয়েস**–আরাম; বিলাস; সুখভোগ। **উপবেশন**– আসন গ্রহণ; বসা। **পরিগ্রহ**– বিশেষভাবে গ্রহণ; ধারণ। **সমাসীন**–উপবিষ্ট; আরূঢ়। **মুলতবি**–একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত; অন্য সময়ের জন্য রেখে দেওয়া। **কল্য**– কাল; আগামীকাল। **চাঁড়াল** –পুরাণোক্ত হিন্দুজাতি বিশেষ; চণ্ডাল। **ব্যগ্র**– ব্যাকুল; ব্যস্ত; আকুল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সপ্তাহের কত সময় রচনার জন্য বাঁধা ছিল?

ক. এক ঘণ্টা খ. দুই ঘণ্টা
গ. তিন ঘণ্টা ঘ. চার ঘণ্টা

২। 'ব্যগ্র হোন কল্য'– এ কথা দিয়ে গণেশ কী বোঝাতে চেয়েছিল?

ক. পকেট মারা গেছে খ. বাঘ এসেছে
গ. অত ব্যস্ত হবেন না ঘ. রেশন শেষ হয়েছে।

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রফিক সাহেব সর্বদা সাধু ভাষায় কথা বলতেন। তিনি সাধুভাষাকে পণ্ডিতবর্গের ভাষা বলে মনে করতেন। তাই চলিত ভাষাকে সব সময় অবজ্ঞা করতেন।

৩। রফিক সাহেব 'গুরুচণ্ডালী' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

ক. সীতানাথ বাবু খ. নিরঞ্জন
গ. গণেশ ঘ. দীপক

৪. উভয় চরিত্রে যে দিকটি ফুটে ওঠেছে, তাহলো–

i. সাধু ভাষার প্রতি দুর্বলতা

ii. ভাষা ব্যবহারে বাড়াবাড়ি

iii. চলিত ভাষার প্রতি ক্ষোভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'রচনার শিল্প গুণ' প্রবন্ধে বলেছেন– যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সে কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভালো নয়, কি বিদেশি কথা, এরূপ আপত্তিগ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করিব না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

ক. স্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিতের নাম কী?

খ. গুরুচণ্ডালী বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত 'গুরুচণ্ডালী' গল্পের কোন বৈশিষ্ট্যটি বিপরীতমুখী?

ঘ. উদ্দীপক ও 'গুরুচণ্ডালী' গল্পে সহজ ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

বুলু

অজিত কুমার গুহ

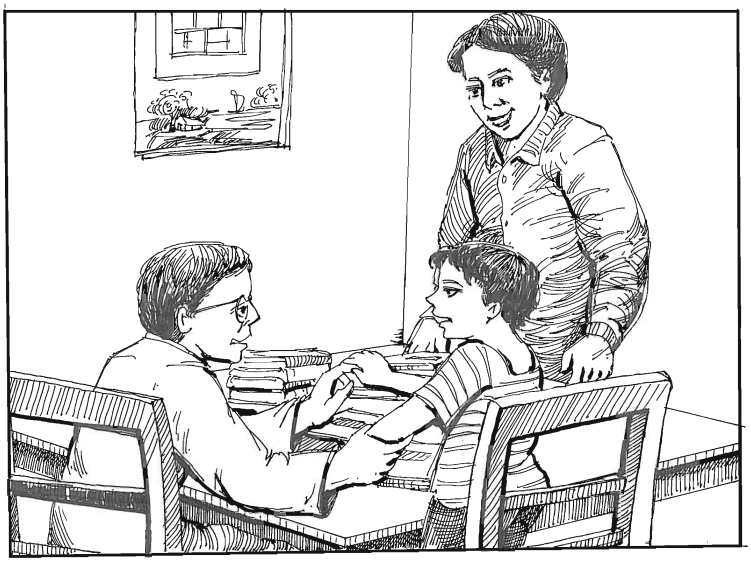

সেদিনের কথা আমার এখনো খুব মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিন দিন থাকার পরই আমাদের কয়েকজনকে বদলি করা হলো দিনাজপুর কারাগারে। তোমরা সবাই জানো কিনা বলতে পারিনে, সরকারি কর্মচারীর মতো সরকারি কয়েদিরও বদলি আছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাদের অবস্থানটা কর্তৃপক্ষের কোনো অজানা কারণে মনঃপূত নয়, তাই আমাদের যেতে হবে সুদূর উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে।

রাত নটার সময় গাড়িতে চেপেছি। বাহাদুরাবাদ ঘাটে গিয়ে যখন নেমেছি, তখন ভোর হয় হয়।খেয়া পারাপারের স্টিমারে যখন উঠেছি, তখন চারদিক অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে নৌকাগুলোর ভেতর থেকে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। শুধু যমুনার কালো জলের ওপর ভোরের প্রথম আভা এসে পড়েছে আর ঝিকমিক করে উঠছে। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ শোনা যায়। ভোর হতেই কিন্তু পটপরিবর্তন হয়ে গেল। অনেকগুলো পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেই তাকিয়ে দেখি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই স্টিমারেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। যদিও আমাদের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও পুলিশের লোক ছিল, তবুও আমরা খোলাখুলিই ছাত্রদের সাথে আলাপ করলাম, আর একসঙ্গে বসে চা-ও খেলাম। তারপর খেয়া পার হয়ে আবার রেলগাড়িতে চেপে দিনাজপুর স্টেশনে এসে নেমেছি।

মনটা খুব দমে গেল। কোথায় আমার চিরপরিচিত ঢাকা আর কোথায় উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তসীমার দিনাজপুর। গাড়ি থেকে নামতেই টের পেলাম যে, হিমালয়ের কাছাকাছি এসেছি। ফাল্গুন মাস। বেলা প্রায় এগারোটা, তবু বেশ শীত। একটা চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিলাম। ডেপুটি-জেলর অফিসেই ছিলেন। গম্ভীর স্বরে আমাদের বসতে বললেন। ইতোমধ্যে আমাদের আসার খবর পেয়ে জেলর সাহেব ছুটে এলেন। এক নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের নিয়ে গেলেন। পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো ঘর। সামনে এক ফালি উঠোন। মাঝখানে একটি বাতাবি লেবুর গাছ, ফুলে ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে; অজস্র মৌমাছি এসে জমেছে আর ফাল্গুনের এলোমেলো বাতাসে চারিদিকে

একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। শুনতে পেলাম, কবি কাজী নজরুল ইসলাম নাকি বন্দী হিসেবে এই জেলে বেশ কিছুদিন ছিলেন। ঐ বাতাবি লেবুগাছের নিচে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে নাকি কবি লিখতেন। ভাবতে পারো, এই খবরটা পেয়ে কেমন লাগল আমার?

মনটা তবু খুবই বিষণ্ন ছিল। সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা মনের মধ্যে ভারী হয়ে আছে। আমরা তিনজন অধ্যাপক ও স্থানীয় একজন উকিল মোট চারজন থাকি এই বাংলোয়, আর থাকে আমাদের কাজ করার জন্য সাধারণ কয়েদি, যাদের জেলখানার নাম হচ্ছে 'ফালতু'।

বিকেল বেলা জেলের ডাক্তার সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার ভালো লাগল। লম্বা, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট- সমস্ত চেহারায় একটা প্রশান্ত নম্রতা। আলাপ করে খুব খুশি হলাম। আমাদের বললেন, আমাকে স্যার, ছাত্রই মনে করবেন, যখন যা দরকার নিঃসঙ্কোচে বলবেন, আমি আপনাদের পরিচর্যার জন্যই রয়েছি। পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার বিদায় হলেন। ডাক্তারের এই একান্ত আপনজনের মতো ব্যবহারে মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ডাক্তার এলেন। সঙ্গে বছর পাঁচেক বয়সের একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। দেখেই আমার খুব ভালো লাগল। ডাক্তার বললেন, আমার ছেলে আপনাদের দেখতে এসেছে। আমি বললাম, খুব ভালো কথা। এমন একজন মহামান্য অতিথি পেয়ে আমরাও ধন্য হয়েছি। বলে কোলে তুলে নিতেই ও বিনা দ্বিধায় আমার কোলে এলো। আদর করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী বলো তো? উত্তরে বলতে লাগল, আমার নাম বুলু, আমার বাবার নাম শাহেদ, আমার মায়ের নাম শামীম, আমার নানার নাম... হঠাৎ ডাক্তারের চোখে চোখ পড়তেই ও থেমে গেল। আমি বলে উঠলাম, হয়েছে, খুব হয়েছে। একেবারে এত নাম কি আমি মনে রাখতে পারি? টেবিল থেকে বিস্কুট এনে ওকে দিলাম। বুলু বেশ সহজভাবেই খেতে লাগল। তারপর টেবিলের ওপর আমার বইগুলো দেখে আমায় বললে, তুমি পড়ো? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে বলতে লাগল, আমিও পড়ি- টিয়ে মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে... ইত্যাদি ইত্যাদি। কার সাধ্য থামায় ওকে। আমি বললাম, আমি তোমার মতো পারিনে। অল্প অল্প পারি। শুনে ও খুব হাসল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এত বড়–পড়তে পারো না? তারপর সে কী হাসি! অবশেষে ডাক্তার ওকে থামালেন।

সেদিন বুলু চলে গেল। কিন্তু পরদিন আবার ঠিক সময়মতো এসে হাজির! ডাক্তার বললেন, কিছুতেই ওকে বাড়ি রাখা গেল না। ও আসবেই। হাতে একটি ছড়ার বই, ঐটি আমাকে পড়ে শোনাবে বলে নিয়ে এসেছে। অগত্যা আমাকে ওসব শুনতে হলো। ডাক্তার সংকুচিত হয়ে বললেন, আপনাকে ও প্রতিদিন খুব বিরক্ত করে। আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। আমি বললাম, এমন বিরক্ত করার লোক এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপে কোথায় পাব আমি। বুলু না এলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

ডাক্তারও আমার অনুরোধে রোজই বুলুকে নিয়ে আসতেন। বুলুকে নিয়ে সময় আমার বেশ ভালোই কাটত। ও চলে গেলেই কেমন খালি খালি লাগত।

বদলির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আবার আমি ঢাকা জেলে ফিরে যেতে পারব। খবর পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। আবার বুলুর কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল! ওকে ছেড়ে থাকতে হবে– এ কথাটা যেন আর ভাবতেই পারিনে। তবু আবার ঢাকা চলে আসতে হলো।

আসবার দিন সকাল বেলায়ই ডাক্তারের সাথে বুলুও এলো। আদর করে ওকে কোলে তুলে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে ওকে বললাম, বুলু, আমি ঢাকা যাব। তুমি আমার কাছে কী চাও?

ও প্রথমে বলল, আমিও ঢাকা যাব। তারপর কী ভেবে হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমীনের কল্লা চাই'। আমি তো অবাক! এ কী কথা এতটুকু শিশুর মুখে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ডাক্তার সাহেব, এবার আপনার সরকারি চাকরি রাখা কঠিন হবে। ছেলের মুখে এসব কী শুনছি।

ডাক্তার অসহায়ের মতো বললেন, কী করব স্যার, জেলখানার সামনেই বাসা। রাতদিন মিছিলের মুখে ঐ কথাই শুনে শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। আমি ঠেকাব কী করে?

এরপর দিনাজপুর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আবার ফিরে এসেছি। প্রথম কদিন বুলুর জন্য খুব মন কেমন করত তারপর আবার ভুলে গিয়েছিলাম।

এতদিনের বিচিত্র পরিবর্তনে এসব কাহিনী ভুলেই গিয়েছিলাম... আর এ কাহিনী বলার কথাও মনে হতো না, যদি না সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটত। সেদিনের পরে সতেরো বছর চলে গেছে। এক সাহিত্য সভা থেকে বাসায় ফিরছি। বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন: আমায় চিনতে পারেন স্যার? আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমার নাম শাহেদ। আমি ডাক্তার। আপনি যখন দিনাজপুর জেলে, তখন আমি ছিলাম সেখানে ডাক্তার।

তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে সেই সতেরো বছর আগেকার ডাক্তার সাহেবের চেহারার কোনো মিলই যেন পাইনে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, আপনার বুলুকে মনে আছে স্যার, বুলু? ও এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছিল। চাকরিও পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন মশাল হাতে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

ডাক্তার আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। আমি স্তব্ধ বুদ্ধবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বহুদিনের বিস্মৃতির অন্ধকারে যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, তা বাইশ বছরের যুবকের নয়, পাঁচ বছরের একটি ছোট্ট শিশুর। আর মনে হলো: কানের কাছে যেন ফিসফিস করে সে বলছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেম। কোনো কথাই বলতে পারলাম না তাঁকে।

লেখক-পরিচিতি

অজিত কুমার গুহ জন্মগ্রহণ করেন ১৫ই এপ্রিল ১৯১৪ সালে কুমিল্লার সুপারিবাগানে। তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়ে কারাভোগ করেন। এ দেশের অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর অবদান ও সাফল্য অপরিসীম। তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপক ও সুবক্তা ছিলেন। মূল্যবান ভূমিকাসহ তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মেঘদূত', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি।

অজিত কুমার গুহ ১৯৬৯ সালের ১২ই নভেম্বর কুমিল্লায় মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

আলোচ্য গল্পের অধ্যাপক গল্পের শুরুতেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলেছেন। তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার কারণে গ্রেপ্তার হন এবং তিন দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকেন। সেখান থেকে তাঁকে বদলি করা হয় দিনাজপুর কারাগারে। বন্দীদেরকে গাড়িতে উঠানো হয়।ভোরবেলা গাড়ি এসে থামে বাহাদুরাবাদ ঘাটে । তখন যমুনা নদীর কালো জলের উপর ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে। লেখক খেয়া পার হয়ে রেলগাড়িতে চেপে বসলেন। ঢাকা ও দিনাজপুরের পার্থক্য চিন্তা করে তার মনটা দমে গেল। দিনাজপুর উত্তরবঙ্গের শেষ সীমায় হিমালয়ের কাছাকাছি অবস্থিত। ফাল্গুন মাস। বেলা এগারোটায়ও শীত। চাঁদর গায়ে জড়িয়ে নিতে হলো।

এরপর লেখককে নিয়ে যাওয়া হলো দিনাজপুর জেলে। সেখানে এক নম্বর ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন বাংলো ঘরে তাঁদের থাকার বন্দোবস্ত হলো। ঘরের সামনে এক ফালি উঠান। মাঝখানে বাতাবি লেবুর গাছ। এই কারাগারে একসময় বন্দী ছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং তিনি ঐ বাতাবি লেবুগাছের নিচে বসে কবিতা লিখতেন।

লেখক অধ্যাপক একজন উকিলসহ চারজন বন্দী থাকেন এখানে। পরিচয়ের পরের দিন বিকেলে জেলের ডাক্তার এলেন ফুটফুটে সুন্দর পাঁচ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ডাক্তারের ছেলের নাম বুলু। সে অনর্গল কথা বলে। তার কথা শুনে বন্দী লেখকের খুব ভালো লাগে। তাঁর সাথে বুলুর সম্পর্ক খুবই গভীর হয়ে যায়।

একদিন লেখককে ঢাকায় বদলি করা হলো। যেদিন চলে আসবেন সেদিন বুলু এসে তাঁর কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমীনের কল্লা চাই।'

এই ঘটনার সতের বছর পর একদিন কথকের বাসার সামনে দিনাজপুর জেলের ডাক্তার শাহেদের সাথে দেখা। শাহেদকে তিনি প্রথম চিনতে পারেননি। পরে পরিচয় দিয়ে ডাক্তার শাহেদ লেখককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বুলু এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছিল। তারপর একদিন হঠাৎ মশাল হাতে মিছিলে গেল, আর ফিরে এলো না।

অধ্যাপক স্তব্ধ ও রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন এবং তিনি স্মৃতিতে খুঁজে পেলেন পাঁচ বছরের শিশু বুলুকে। এ গল্পে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শিশু বুলু, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মিছিলে শহিদ যুবক বুলুতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

কয়েদি– কারাগারে বন্দী। কর্তৃপক্ষ– নিয়ন্ত্রণকারী। খেয়া পারাপার– নদীর এপার থেকে ওপারে নৌকায় যাওয়া। গোয়েন্দা বিভাগ– গুপ্তচর বিভাগ; রহস্য সন্ধানী বিভাগ। প্রান্তসীমা– শেষ কিনারা, ধার (এখানে প্রান্তসীমা বলতে সীমান্তকে বোঝানো হয়েছে) হিমালয়– উত্তর দিকের বিশাল পাহাড়। ডেপুটি জেলর– উপ-কারাপ্রধান।এক ফালি উঠান– ছোট্ট একটু উঠান। গৌরবর্ণ– ফর্সা গায়ের রং; শ্বেতাঙ্গ। প্রশস্ত ললাট– চওড়া কপাল। প্রশান্ত নম্রতা– অতিশয় শান্ত; বিনয়ী। নিঃসঙ্কোচ– দ্বিধাহীন; সংকোচহীন।

পরিচর্যা– সেবা; শুশ্রূষা। প্রতিশ্রুতি– প্রতিজ্ঞা। অগত্যা– অন্য গতি নেই বলে। সংকুচিত– অপ্রশস্ত; কমে গেছে এমন। বিচ্ছিন্নতার দ্বীপ– পৃথক দ্বীপ; সম্পর্কশূন্য স্থান। মঞ্জুর– গ্রহণ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই– ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা প্রদানের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলনে ব্যবহৃত জনপ্রিয় স্লোগান। কল্লা– মাথা। রুদ্ধবাক– কথা বন্ধ হয়ে যাওয়া; বোবা হওয়া। বিস্মৃতির অন্ধকার– স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। লেখককে ঢাকা হতে কোন কারাগারে স্থানান্তর করা হয়?

ক. কুমিল্লা খ. বরিশাল
গ. দিনাজপুর ঘ. রাজশাহী

২। ডাক্তার সাহেব লেখককে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠল কেন?

ক. হতাশ হয়েছিলেন বলে খ. বুলু মারা যাওয়ায়
গ. দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ায় ঘ. প্রথমে চিনতে পারেনি

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভাষা আন্দোলনের সময় রাকিবের বয়স ছিল আট বছর। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার অপরাধে তার বাবা গ্রেফতার হন। সেই রাকিব ১৯৬৯ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় গণ আন্দোলনের মিছিলে প্রাণ দেয়।

৩। উদ্দীপকের রাকিবের সঙ্গে 'বুলু' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে?

ক. বুলু খ. শাহেদ
গ. শামীম ঘ. লেখক

৪. উভয় চরিত্রে যে দিকটি ফুটে ওঠেছে তা হলো–

i. আত্মসচেতনতা
ii. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা
iii. গণআন্দোলনে লক্ষ্যে পৌঁছানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

পাঁচ বছরের ছেলে সুমনকে নিয়ে এক বন্ধুর বাসায় বেড়াতে যাই। বন্ধু জ্ঞানী ব্যক্তি– টেবিলে অনেক বড় বড় বই। প্রথম সাক্ষাতেই সুমন আলাপ জমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। একথা- সেকথা। তুমি এত বই পড়। লেখাগুলোতো খুবই ছোট- দেখ কী করে? বন্ধুটিও বেশ মজার মানুষ। সে মজা করে তার চশমাটা পরিয়ে দেয়। বন্ধুটি সুমনকে চকলেট দেয়। সুমন তাকে মুহূর্তের মধ্যে ২/৩ টি ছড়া শুনিয়ে দেয়। কয়েক মিনিটের প্রথম সাক্ষাতেই দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে যায়।

ক. জেল খানার ডাক্তার কখন এলেন?

খ. অধ্যাপককে ঢাকা হতে দিনাজপুর কারাগারে বদলী করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে সুমনের মধ্যে বুলুর কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকটি 'বুলু' গল্পের সমগ্রভাব ধারণ করেনি– যুক্তসহ বিশ্লেষণ কর।

মানুষের মন

বনফুল

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল– এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি – উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশি। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ : শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচাখোঁচা চিরুনি-সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মতো পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বাগোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটি তন্ময় ভাব। গোঁফ-দাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠী। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আরেকজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কমবাইন্ড হ্যান্ড' চাকর, নরেশের জন্য 'ফাউল কাটলেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ট রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন ! মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এমএ পাস – নরেশ কেমিস্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমানভাবে নগদ টাকাও দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে তাঁহারা বাস করিতেছেন – ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে ইহাতে দুই-তিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন– 'কা তব কান্তা'– ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন - নির্মলা সত্যিই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না – এই মাত্র!

সুতরাং নরেশ ও পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়িতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালোবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ ও পরেশের ছোটভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ ও তপেশের স্ত্রী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ ও পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই : 'আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।' পল্টুকে লইয়া নরেশ ও পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। পরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই নরেশ বলিলেন–'বাকি অর্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক !' তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কী!

পল্টু নরেশ ও পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুরগি সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েক দিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোনো নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না – যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোলো বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য, ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালোবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ ও পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ; তিনি স্বভাবতই একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল জ্বর ছাড়িল না, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন– একজন ভালো কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হতো?

'বেশ দেখাও–'

কবিরাজ আসিলেন, সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল; পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, 'আচ্ছা একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্ঠিটা দেখালে কেমন হয়? কী বলো?'

'বেশ তো! তবে, যাই করও এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন– টাইফয়েড!'

'তাই নাকি?'

পল্টুর কুষ্ঠী লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন– 'মঙ্গাল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।' কী করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গালশান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন-

'কবিরাজি ওষুধ তো বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব নাকি?'

'তাই ডাকো না-হয়–'

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপট্টি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে– 'মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়!'

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, শুনিয়াছিল তারকেশ্বরে গিয়া ধরনা দিলে দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক!

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন–'আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু-একদিন দেরি হবে।'

'হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?'

'বাবার কাছে ধরনা দেব।'

নরেশ কিছু বলিলেন না, ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন–'বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।'

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন-দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন : 'বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম।

তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইনজেকশন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলে সেরে যাবে।'

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ানো চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাঙহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইনজেকশন দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েক দিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন! 'ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।'

'অ্যাঁ, বলো কী!'

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মতো পরেশ ছুটিয়া নিচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

'হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই— বুঝলেন —হ্যালো—বুঝলেন— আপত্তি নেই— আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগগির আসুন- আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—'

এদিকে নরেশ পাগলের মতো চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন— 'পল্টু খাও— খাও তো বাবা— একবার খেয়ে নাও একটু—'

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল।

লেখক-পরিচিতি

১৮৯৯ সালের ১৯শে জুলাই বনফুল বিহারের পূর্ণিমা জেলার মনিহারি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মারা যান। তাঁর প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে আইএসসি পাস করে ডাক্তারি পড়তে আসেন কলকাতায়। ১৯২৭ সালে ডাক্তারি পাস করে ভাগলপুরে প্যাথলজিস্ট হিসেবে ৪০ বছর কাজ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। বিষয় ও আয়তনে ক্ষুদ্র ছোটগল্পের জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাকার সব ধরনের রচনাতেই তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা: 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'হাটেবাজারে', 'কিছুক্ষণ', 'বিন্দুবিসর্গ', 'দ্বৈরথ', 'ভীমপলশ্রী', 'শ্রীমধুসূদন ও বিদ্যাসাগর'। পাখির পৃথিবী নিয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ডানা'। সাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক এবং ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

নরেশ ও পরেশ সহোদর। কিন্তু সমান কিংবা একই বোধ-বুদ্ধির মানুষ নয়। নরেশ গোঁড়া বৈজ্ঞানিক আর পরেশ বৈষ্ণব। নরেশ খায় কাটলেট, পরেশ নিরামিষভোজী। নরেশের আগ্রহ রিলেটিভিটি থিওরির প্রতি, পরেশের আগ্রহ যোগ ও রামায়ণের প্রতি। কিন্তু এ ভিন্নতা সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয় না বললেই চলে। বরং যার যার মতো নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায়। কেমিস্ট্রি এবং সংস্কৃতে এমএ পাস এ যুবকেরা কেউই বিয়ে করেননি। পরেশ ভাবে 'কা তব কান্তা'– তোমার আপন কে? আর নরেশের নির্মলা গতায়ু। কিন্তু ছোটভাই তপেশ ও তার স্ত্রী মনোরমা কলেরায় মারা গেলে তাদের সন্তান পল্টুকে এরা নিয়ে আসে। পল্টু এদের দুজনেরই নয়নের মণি। উভয়েই পল্টুকে খুব ভালোবাসে।

পল্টু জ্বরে আক্রান্ত হলে নরেশ নিয়ে আসে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, পরেশ নিয়ে আসে কবিরাজ। জ্বর আরও বাড়লে পরে কুষ্ঠি দেখার জন্য নিয়ে আসে জ্যোতিষীকে। ডাক্তার বলেন টাইফয়েড, আর জ্যোতিষী বলেন 'মঙ্গাল মারকেশ রুষ্ট হয়েছে'। সুতরাং একদিকে চলল অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা, অন্যদিকে চরণামৃত পান। বিপরীতধর্মী এ চিকিৎসায় পল্টুর অবস্থা যখন খুবই খারাপ তখন নরেশ আর পরেশের অবস্থান যায় পাল্টে, মনের গতিবিধি যায় ঘুরে। পরেশ তখন বলে ডাক্তার ডাকার কথা, ইনজেকশন দেওয়ার কথা; আর নরেশ পল্টুকে চরণামৃত খাওয়ানোর চেষ্টায় প্রাণান্ত চেষ্টা করে।

শব্দার্থ ও টীকা

নেউল– বেজি। **সূক্ষ্মাগ্র**– যার অগ্রভাগ খুব ধারালো। **শুকচঞ্চু নাসা**– টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো নাক। **খর্বাকৃতি**– যার আকার খাটো। **কেশদাম**– চুলের গুচ্ছ। **তন্ময়**– খুব মনোযোগী। **কণ্ঠী**– গলায় পরার অলঙ্কার। **চন্দন**– সুগন্ধি কাঠবিশেষ। **গোঁড়া**– অন্ধ বিশ্বাসী ও একগুঁয়ে। **জ্ঞানমার্গ**– সাধনার পথে একমাত্র জ্ঞান। **ভক্তিমার্গ**– সাধনার পথে একমাত্র ভক্তি। **কমবাইন্ড হ্যান্ড**– বিপরীতধর্মী একাধিক কাজ করতে পারা। **থিওরি অব রিলেটিভিটি**– আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। গ্যালিলিও এ তত্ত্বের ইঙ্গিত দিলেও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে জার্মান বিজ্ঞানি আইনস্টাইন এ তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করেন। এ তত্ত্বের মাধ্যমে বস্তু, ভর, শক্তি ও গতির সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। **উন্মত্ত**– উত্তেজিত; ক্ষিপ্ত; পাগল; উন্মাদ। **মুখাপেক্ষী**– অন্যের সাহায্যনির্ভর। **স্বচ্ছন্দে**– অবলীলায়; সহজভাবে। **উপলব্ধি**– অনুভব। **অনিত্যতা**– চিরকাল টিকে থাকে না এমন। **কা তব কান্তা**– কেউ আপন নয়। **সন্তোষার্থে**– সন্তুষ্ট করার জন্য। **মতবাদ**– কোনো বিশেষ আদর্শ; চিন্তা; মূল্যবোধ। **অভিরুচি**– ইচ্ছা; অভিপ্রায়। **হবিষ্যান্ন**– হিন্দুসম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণে আহার্য; আমিষবর্জিত ঘিমাখা আতপ চাল। **সর্বান্তঃকরণে**– মনে-প্রাণে। **জ্যোতিষী**- জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ; যিনি ভাগ্যরেখা গণনা করেন; গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয় করে যিনি মানুষের শুভাশুভ বিচার-বিশ্লেষণ করেন। **কুষ্ঠি**– জন্মপত্রিকা। **টাইফয়েড**– একধরনের জ্বর। **মঙ্গাল মারকেশ**– দেবতা বিশেষ। **তারকেশ্বর**– হুগলি জেলার একটি থানা। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত শিবতীর্থ। কলিকাতা থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানেই তারকানাথের মন্দির অবস্থিত। **চরণামৃত**– হিন্দুসমাজে প্রচলিত গুরুদেবের পা-ধোয়া জল। **পাদোদক**– কোনো দেবমূর্তি বা সম্মানিত ব্যক্তির পা-ধোয়া জল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের মন গল্পে পল্টুর বয়স কত?

ক. পনের খ. ষোলো
গ. সতের ঘ. আঠার

২. নরেশ ও পরেশের মধ্যে ঝগড়া না হওয়ার কারণ কোনটি?

ক. যার যার মত নিজস্ব বিশ্বাসে চলতো
খ. কারো সঙ্গে কথা বলতো না
গ. দু'জন আলাদা ঘরে বাস করতো
ঘ. দুজনই বোবা ছিল।

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আরিফ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আরিফের বাবা মা স্থানীয় কবিরাজের কাছে নিয়ে যায়। কবিরাজ দীর্ঘদিন ঝাড়-ফুঁক দিয়ে চিকিৎসার নামে সময় নষ্ট করে। কিছু দিন রোগে ভোগার পর আরিফ মারা যায়।

৩. আরিফ 'মানুষের মন' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিচ্ছবি?

ক. তাপস খ. পল্টু
গ. পরেশ ঘ. নরেশ

৪. আরিফের বাবা মার মধ্যে 'মানুষের মন' গল্পের কোন দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ক. আধুনিক মানসিকতার অভাব খ. আর্থিক অসচ্ছলতা
গ. ঝাড়-ফুঁক অসুখ সারায় ঘ. যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

অমিত ও সুমিতের বন্ধুত্ব দৃঢ়। অমিতের বিশ্বাস দৈবে আর সুমিতের যুক্তিতে। চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সুমিত মনে করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা ভালো। আর অমিতের ধারণা ঝাড়-ফুকে অসুখ সারে। আকাশ-পাতাল পার্থক্য দু'জনের মধ্যে কিন্তু কখনো বোঝা-পড়ায় ভুল বুঝাবুঝি নেই। আরেক বন্ধু তারেকের অসুস্থতায় দু'জনের বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেল। অমিত দৈব ছেড়ে যুক্তিতে সুমিত যুক্তি ছেড়ে দৈবে আশ্রয় খোঁজে।

ক. পল্টুর বাবার নাম কী?
খ. পরেশের বুকটা কেঁপে ওঠলো কেন?
গ. যে কারণে সুমিত 'মানুষের মন' গল্পের নরেশের প্রতিনিধি তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকটি 'মানুষের মন' গল্পের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র– বক্তব্যটি বিচার কর।

আদুভাই

আবুল মনসুর আহমদ

এক

আদুভাই ক্লাস সেভেনে পড়তেন। ঠিক পড়তেন না বলে পড়ে থাকতেন বলাই ভালো। কারণ ঐ বিশেষ শ্রেণি ব্যতীত আর কোনো শ্রেণিতে তিনি কখনো পড়েছেন কি না, পড়ে থাকলে ঠিক কবে পড়েছেন, সে-কথা ছাত্ররা কেউ জানত না। শিক্ষকরাও অনেকে জানতেন না বলেই বোধ হতো।

শিক্ষকরাও অনেকে তাঁকে 'আদুভাই' বলে ডাকতেন। কারণ নাকি এই যে, তাঁরাও এককালে আদুভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন এবং সবাই নাকি ক্লাস সেভেনেই আদুভাইয়ের সঙ্গে পড়েছেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেনে আদুভাইয়ের সহপাঠী হলাম তত দিনে আদুভাই ঐ শ্রেণির পুরাতন টেবিল-ব্ল্যাকবোর্ডের মতোই নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছেন।

আদুভাইয়ের এই অসাফল্যে আর যে-ই যত হতাশ হোক, আদুভাইকে কেউ কখনো বিষণ্ন দেখেনি। কিম্বা নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কখনো কোনো শিক্ষক বা পরীক্ষককে অনুরোধ করেননি। যদি কখনো কোনো বন্ধু বলেছে : যান না আদুভাই, যে কয় সাবজেক্টে শর্ট আছে, শিক্ষকদের বলে কয়ে নম্বরটা নিন না বাড়িয়ে। তখন গম্ভীরভাবে আদুভাই জবাব দিয়েছেন, সব সাবজেক্টে পাকা হয়ে ওঠাই ভালো।

কোন কোন সাবজেক্টে শর্ট, সুতরাং পাকা হওয়ার প্রয়োজন আছে, তা কেউ জানত না। আদুভাইও জানতেন না; জানবার কোনো চেষ্টাও করেননি; জানবার আগ্রহও যে তাঁর আছে, তাও বোঝবার উপায় ছিল না। বরং তিনি যেন মনে করতেন, ও রকম আগ্রহ প্রকাশ করাই অন্যায় ও অসঙ্গত। তিনি বলতেন, যেদিন তিনি সব সাবজেক্টে পাকা হবেন, প্রমোশন সেদিন তাঁর কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে শুভ দিন যে একদিন আসবেই সে-বিষয়ে আদুভাইয়ের এতটুকু সন্দেহ কেউ কখনো দেখেনি।

কত খারাপ ছাত্র প্রশ্নপত্র চুরি করে অপরের খাতা নকল করে আদুভাইয়ের ঘাড়ের উপর দিয়ে প্রমোশন নিয়ে চলে গিয়েছে, এ ধরনের ইঙ্গিত আদুভাইয়ের কাছে কেউ করলে, তিনি গর্জে উঠে বলতেন, জ্ঞানলাভের জন্যই আমরা স্কুলে পড়ি, প্রমোশন লাভের জন্য পড়ি না।

সে জন্য অনেক সন্দেহবাদী বন্ধু আদুভাইকে জিজ্ঞেস করেছে, আদুভাই, আপনার কী সত্যিই প্রমোশনের আশা আছে?

নিশ্চিত বিজয়গৌরবে আদুভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি তাচ্ছিল্যভরে বলেছেন, আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতেই হবে। তবে হ্যাঁ, উন্নতি আস্তে আস্তে হওয়াই ভালো। যে গাছ লকলক করে বেড়েছে, সামান্য বাতাসেই তার ডগা ভেঙেছে।

সেজন্য আদুভাইকে কেউ কখনো পিছনের বেঞ্চিতে বসতে দেখেনি। সামনের বেঞ্চিতে বসে তিনি শিক্ষকদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, হাঁ করে গিলতেন, মাথা নাড়তেন ও প্রয়োজনমতো নোট করতেন। খাতার সংখ্যা ও সাইজে আদুভাই ছিলেন ক্লাসের একজন অন্যতম ভালো ছাত্র।

শুধু ক্লাসের নয়, স্কুলের মধ্যে তিনি সবার আগে পৌঁছাতেন। এ ব্যাপারে শিক্ষক কি ছাত্র—কেউ তাঁকে কোনোদিন হারাতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি।

স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় আদুভাইকে আমরা বরাবর দুটো পুরস্কার পেতে দেখেছি। আমরা শুনেছি, আদুভাই কোন অনাদিকাল থেকে ঐ দুটো পুরস্কার পেয়ে আসছেন। তার একটি, স্কুল কামাই না করার জন্য; অপরটি সচ্চরিত্রতার জন্য। শহরতলির পাড়া-গাঁ থেকে রোজ রোজ পাঁচ মাইল রাস্তা তিনি হেঁটে আসতেন বটে; কিন্তু ঝড়-তুফান, অসুখ-বিসুখ কিছুই তাঁর এ কাজের অসুবিধে সৃষ্টি করে উঠতে পারেনি। চৈত্রের কালবোশেখি বা শ্রাবণের ঝড়ঝঞ্ঝায় যেদিন পশুপক্ষীও ঘর থেকে বেরোয়নি, সেদিনও ছাতার নিচে নুড়িমুড়ি হয়ে, বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আদুভাইকে স্কুলের পথে এগোতে দেখা গিয়েছে। মাইনের মমতায় শিক্ষকরা অবশ্য স্কুলে আসতেন। তেমন দুর্যোগে ছাত্ররা কেউ আসেনি নিশ্চিত জেনেও নিয়ম রক্ষার জন্য তাঁরা ক্লাসে একটি উঁকি মারতেন। কিন্তু তেমন দিনেও অন্ধকার কোণ থেকে 'আদাব, স্যার' বলে যে-একটি ছাত্র শিক্ষকদের চমকিয়ে দিতেন, তিনি ছিলেন আদুভাই। আর চরিত্র? আদুভাইকে কেউ কখনো রাগ কিংবা অভদ্রতা করতে কিংবা মিছে কথা বলতে দেখেনি।

স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রথম পরীক্ষাতেই আমি ফার্স্ট হলাম। সুতরাং আইনত আমি ক্লাসের মধ্যে সবচাইতে ভালো ছাত্র এবং আদুভাই সবার চাইতে খারাপ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কী জানি কেন, আমাদের দুজনার মধ্যে একটা বন্ধন সৃষ্টি হলো। আদুভাই প্রথম থেকেই আমাকে যেন নিতান্ত আপনার লোক বলে ধরে নিলেন। আমার ওপর যেন তাঁর কতকালের দাবি।

আদুভাই মনে করতেন, তিনি কবি ও বক্তা। স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় তিনি বক্তৃতা ও স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা শুনে সবাই হাসত। সে হাসিতে আদুভাই লজ্জাবোধ করতেন না, নিরুৎসাহও হতেন না। বরঞ্চ তাকে তিনি প্রশংসাসূচক হাসিই মনে করতেন। তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত।

অন্যসব ব্যাপারে আদুভাইকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হতো। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে তাঁর নির্বুদ্ধিতা দেখে আমি দুঃখিত হতাম। তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই তামাশা করছেন, অথচ তিনি তা বুঝতে পারছেন না, দেখে আমার মন আদুভাইয়ের পক্ষপাতী হয়ে উঠত।

গেল এইভাবে চার বছর। আমি ম্যাট্রিকের জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। আদুভাই কিন্তু সেবারও যথারীতি ক্লাস সেভেনেই অবস্থান করছিলেন।

দুই

ডিসেম্বর মাস।

সব ক্লাসের পরীক্ষা ও প্রমোশন হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবেচনা, দ্বিতীয় বিবেচনা, তৃতীয় বিবেচনা ও বিশেষ বিবেচনা ইত্যাদি সকল প্রকারের বিবেচনা হয়ে গিয়েছে। বিবেচিত প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের ন্যায় সেবারও পাস-করা প্রমোশন-প্রাপ্তের সংখ্যার দ্বিগুণেরও ঊর্ধ্বে উঠেছে।

কিন্তু আদুভাই এসব বিবেচনার বাইরে। কাজেই তাঁর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে আমরা টিউটরিয়েল ক্লাস করছিলাম। ছাত্ররা শুধু শুধু স্কুলপ্রাঙ্গণে জটলা করছিল—প্রমোশন পাওয়া ছেলেরা নিজেদের কীর্তি-উজ্জ্বল চেহারা দেখাবার জন্য, আর না-পাওয়া ছেলেরা প্রমোশনের কোনো প্রকার অতিরিক্ত বিশেষ বিবেচনার দাবি জানাবার জন্য।

এমন দিনে একটু নিরালা জায়গায় পেয়ে হঠাৎ আদুভাই আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলাম। আদুভাইকে আমরা সবাই মুরব্বি মানতাম। তাই তাঁকে ক্ষিপ্রহস্তে টেনে তুলে প্রতিদানে তাঁর পা ছুঁয়ে বললাম, কী হয়েছে আদুভাই, অমন পাগলামি করলেন কেন?

আদুভাই কম্পিত কণ্ঠে বললেন, প্রমোশন।

আমি বিস্মিত হলাম; বললাম, প্রমোশন? প্রমোশন কী? আপনি প্রমোশন পেয়েছেন?

: না, আমি প্রমোশন পেতে চাই।

: ও, পেতে চান? সে তো সবাই চায়।

আদুভাই অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ-কম্পিত ও সংকোচ-জড়িত প্যাঁচ-মোচড় দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম এই যে, প্রমোশনের জন্য এত দিন তিনি কারও কাছে কিছু বলেননি; কারণ, প্রমোশন জিনিসটাকে যথাসময়ের পূর্বে এগিয়ে আনাটা তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবার তাঁকে প্রমোশন পেতেই হবে। সে

নির্জনতায়ও তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে সেই কারণটি বললেন। তা এই যে, আদুভাইর ছেলে সেবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। নিজের ছেলের প্রতি আদুভাইয়ের কোনো ঈর্ষা নেই। কাজেই ছেলের সঙ্গে এক শ্রেণিতে পড়ার তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদুভাইয়ের স্ত্রীর তাতে ঘোরতর আপত্তি আছে। ফলে, হয় আদুভাইকে এবার প্রমোশন পেতে হবে, নয়তো পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হবে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আদুভাই বাঁচবেন কী নিয়ে?

আমি আদুভাইয়ের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। তাঁর অনুরোধে আমি শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করতে যেতে রাজি হলাম।

প্রথমে ফারসি শিক্ষকের কাছে যাওয়া স্থির করলাম। কারণ, তিনি একদা আমাকে মোট একশত নম্বরের মধ্যে একশত পাঁচ নম্বর দিয়েছিলেন। বিস্মিত হেডমাস্টার তার কারণ জিজ্ঞেস করায় মৌলবি সাব বলেছিলেন, 'ছেলে সমস্ত প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দেওয়ায় সে পূর্ণ নম্বর পেয়েছে। পূর্ণ নম্বর পাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আমি খুশি হয়ে তাকে পাঁচ নম্বর বখশিশ দিয়েছি।' অনেক তর্ক করেও হেডমাস্টার মৌলবি সাবকে এই কাজের অসঙ্গতি বোঝাতে পারেননি।

মৌলবি সাব আদুভাইয়ের নাম শুনে জ্বলে উঠলেন। অমন বেতমিজ ও খোদার না-ফরমান বান্দা তিনি কখনো দেখেননি বলে আস্ফালন করলেন এবং অবশেষে টিনের বাক্স থেকে অনেক খুঁজে আদুভাইয়ের খাতা বের করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন, দেখ।

আমি দেখলাম, আদুভাই মোটে তিন নম্বর পেয়েছে। তবু হতাশ হলাম না। পাসের নম্বর দেওয়ার জন্য তাঁকে চেপে ধরলাম।

বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, নম্বর সাবমিট করে ফেলেছেন, বিবেচনার স্তর পার হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি সমস্ত যুক্তির আমি সন্তোষজনক জবাব দিলাম। তিনি বললেন, তুমি কার জন্য, কী অন্যায় অনুরোধ করছ; খাতাটা খুলেই একবার দেখ না।

আমি মৌলবি সাবকে খুশি করবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অনাবশ্যক বোধেও খাতাটা খুললাম। দেখলাম : ফারসি পরীক্ষা বটে, কিন্তু খাতার কোথাও একটি ফারসি হরফ নেই। তার বদলে ঠাস-বুনানো বাংলা হরফে অনেক কিছু লেখা আছে। কৌতূহলবশে পড়ে দেখলাম : এই বঙ্গদেশে ফারসি ভাষা আমদানির অনাবশ্যকতা ও ছেলেদের তা শিখবার চেষ্টার মূর্খতা সম্বন্ধে আদুভাই যুক্তিপূর্ণ একটি ' থিসিস' লিখে ফেলেছেন।

পড়া শেষ করে মৌলবি সাবের মুখের দিকে চাইতেই বিজয়ের ভঙ্গিতে বললেন, দেখেছ বাবা বেতমিজের কাজ? আমি নিতান্ত ভালো মানুষ বলেই তিনটে নম্বর দিয়েছি, অন্য কেউ হলে রাসটিকেটের সুপারিশ করত।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত মৌলবি সাব আমার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না। খাতার উপর ৩-এর পৃষ্ঠে ৩ বসিয়ে ৩৩ করে দিলেন।

আমি বিপুল আনন্দে অঙ্কের পরীক্ষকের বাড়ি ছুটলাম।

সেখানে আদুভাইয়ের খাতার উপর লাল পেন্সিলের একটি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল আঁকা রয়েছে। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝেও আমার উদ্দেশ্য বললাম। অঙ্কের মাস্টার তো হেসেই খুন। হাসতে-হাসতে তিনি আদুভাইয়ের খাতা বের করে

আমাকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন। তাতে আদুভাই লিখেছেন যে, প্রশ্নকর্তা ভালো ভালো অঙ্কের প্রশ্ন ফেলে কতকগুলো বাজে ও অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছেন। সেজন্য এবং প্রশ্নকর্তার ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে আদুভাই নিজেই কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রশ্ন লিখে তার বিশুদ্ধ উত্তর দিচ্ছে—এইরূপ ভূমিকা করে আদুভাই যে-সমস্ত অঙ্ক করেছেন, শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নপত্র ও খাতা মিলিয়ে আমাকে দেখালেন যে, প্রশ্নের সঙ্গে আদুভাইর উত্তরের সত্যিই কোনো সংস্রব নেই।

প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিল থাক আর না থাক; খাতায় লেখা অঙ্ক শুদ্ধ হলেই নম্বর পাওয়া উচিত বলে আমি শিক্ষকের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করলাম। শিক্ষক মশায়, যাহোক, প্রমাণ করে দিলেন যে, তাও শুদ্ধ হয়নি।

সুতরাং পাসের নম্বর দিতে তিনি রাজি হলেন না। তবে তিনি আমাকে এই আশ্বাস দিলেন যে, অন্য সব সাবজেক্টের শিক্ষকদের রাজি করাতে পারলে তিনি আদুভাইয়ের প্রমোশনে সুপারিশ করতে প্রস্তুত আছেন।

নিতান্ত বিষণ্নমনে অন্য পরীক্ষকদের নিকটে গেলাম। সর্বত্র অবস্থা প্রায় একরূপ। ভূগোলের খাতায় তিনি লিখেছেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এমন গাঁজাখুরি গল্প তিনি বিশ্বাস করেন না। ইতিহাসের খাতায় লিখেছেন যে, কোন রাজা কোন সম্রাটের পুত্র এসব কথার কোনো প্রমাণ নেই। ইংরেজির খাতায় তিনি নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের ছবি পাশাপাশি আঁকবার চেষ্টা করেছেন—অবশ্য কে যে সিরাজ, কে যে ক্লাইভ, নিচে লেখা না থাকলে তা বোঝা যেত না।

হতাশ হয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম। আদুভাই আগ্রহ - ব্যাকুল চোখে আমার পথপানে চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

আমি ফিরে এসে নিষ্ফলতার খবর দিতেই তাঁর মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তবে আমার কী হবে ভাই? বলে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছু একটা করবার জন্য আমার প্রাণও ব্যাকুল হয়ে উঠল। বললাম, তবে কী আদুভাই, আমি হেডমাস্টারের কাছে যাব?

আদুভাই ক্ষণিক আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললেন, তুমি আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য ধন্যবাদ। হেডমাস্টারের কাছে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সেখানে যেতে হয় আমিই যাব। হেডমাস্টারের কাছে জীবনে আমি কিছু চাইনি। এই প্রার্থনা তিনি আমার ফেলতে পারবেন না।

বলেই তিনি হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে দ্রুতগমনশীল আদুভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি দৃষ্টির আড়াল হলে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের কাজে মন দিলাম।

তিন

সেদিন বড়দিনের ছুটি আরম্ভ। শুধু হাজিরা লিখেই স্কুল ছুটি দেওয়া হলো।

আমি বাইরে এসে দেখলাম : স্কুলের গেটের সামনে একটি পোস্তার ওপর একটি উঁচু টুল চেপে তার ওপর দাঁড়িয়ে আদুভাই হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা করছেন। ছাত্ররা ভিড় করে তাঁর বক্তৃতা শুনছে এবং মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছে।

আমি শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আদুভাই বলছিলেন, হ্যাঁ, প্রমোশন আমি মুখফুটে কখনো চাইনি। কিন্তু সেজন্যই কী আমাকে প্রমোশন না-দেয়া এঁদের উচিত হয়েছে? মুখফুটে না চেয়ে এত দিন আমি এঁদের আক্কেল পরীক্ষা করলাম। এঁদের মধ্যে দানাই বলে কোনো জিনিস আছে কি না, আমি তা যাচাই করলাম। দেখলাম, বিবেচনা বলে কোনো জিনিস এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা নির্মম, হৃদয়হীন। একটি মানুষ যে চোখ বুজে এঁদের বিবেচনার ওপর নিজের জীবন ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, এঁদের প্রাণ বলে কোনো জিনিস থাকলে সে কথা কি এঁরা এত দিন ভুলে থাকতে পারতেন?

আদুভাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি বাম হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন, আমি এঁদের কাছে কী আর বিশেষ চেয়েছিলাম? শুধুমাত্র একটি প্রমোশন। তা দিলে এঁদের কী এমন লোকসান হতো? মনে করবেন না, প্রমোশন না-দেয়ায় আমি রেগে গেছি। রাগ আমি করিনি। আমি শুধু ভাবছি, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর হাজার হাজার ছেলের বাপ-মা ছেলেদের জীবনের ভার দিয়ে নিশ্চিত থাকেন, তাঁদের আক্কেল কত কম। তাঁদের প্রাণের পরিসর কত অল্প!

একটু দম নিয়ে আদুভাই আরম্ভ করলেন, আমি বহুকাল এই স্কুলে পড়ছি। একদিন এক পয়সা মাইনে কম দেইনি। বছর-বছর নতুন-নতুন পুস্তক ও খাতা কিনতে আপত্তি করিনি। ভাবুন, আমার কতগুলো টাকা গিয়েছে। আমি যদি প্রমোশনের এতই অযোগ্য ছিলাম, তবে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে একজন শিক্ষকও আমায় কেন বললেন না, 'আদুমিঞা, তোমার প্রমোশনের কোনো চান্স নেই, তোমার মাইনেটা আমরা নেব না।' মাইনে দেবার সময় কেউ বারণ করলেন না, পুস্তক কেনবার সময় কেউ নিষেধ করলেন না। শুধু প্রমোশনের বেলাতেই তাঁদের যত নিয়মকানুন এসে বাঁধল? আমি ক্লাস সেভেন পাস করতে পারলাম না বলে ক্লাস এইটেও পাস করতে পারতাম না, এই কথা এঁদের কে বলেছে? অনেকে ম্যাট্রিক-আইএ-তে কোনোমতে পাস করে বিএ এমএ - তে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে, দৃষ্টান্ত আমি অনেক দেখাতে পারি। কোনো কুগ্রহের ফেরেই আমি ক্লাস সেভেনে আটকে পড়েছি। একবার কোনোমতে এই ক্লাসটা ডিঙোতে পারলেই আমি ভালো করতে পারতাম, এটা বোঝা মাস্টারবাবুদের উচিত ছিল। আমাকে একবার ক্লাস এইটে প্রমোশন দিয়ে আমার লাইফের একটা চান্স এঁরা দিলেন না!

আদুভাইয়ের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। তিনি খানিক থেমে ধুতির খুঁটে নাক-চোখ মুছে নিলেন। দেখলাম, শ্রোতৃগণের অনেকের গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে।

গলা পরিষ্কার করে আদুভাই আবার শুরু করলেন, আমি কখনো এতসব কথা বলিনি, আজও বলতাম না। বললাম শুধু এই জন্য যে, আমার বড় ছেলে এবার ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। সে-ও এই স্কুলেই পড়ত। এই স্কুলের শিক্ষকদের বিবেচনায় আমার আস্থা নেই বলেই আমি গতবারই আমার ছেলেকে অন্য স্কুলে ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম। যথাসময়ে এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে, আজ আমাকে কী অপমানের মুখে পড়তে হতো, তা আপনারাই বিচার করুন।

আদুভাইয়ের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি গলায় দৃঢ়তা এনে আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু আমি সত্যকে জয়যুক্ত করবই। আমি একদিন ক্লাস এইটে ···

এই সময় স্কুলের দারোয়ান এসে সভা ভেঙে দিল। আমি আদুভাইয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে চুপে চুপে সরে পড়লাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে—সংসার-সাগরের প্রবল স্রোতে কে কোথায় ভেসে গেলাম, কেউ জানলাম না।

চার

আমি সেবার বিএ পরীক্ষা দেব। খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ লাল লেফাফার এক পত্র পেলাম। কারও বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র হবে মনে করে খুললাম। ঝরঝরে তকতকে সোনালি হরফে ছাপা পত্র। পত্রলেখক আদুভাই। তিনি লিখেছেন, তিনি সেবার ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছেন বলে বন্ধুবান্ধবদের জন্য কিছু ডালভাতের ব্যবস্থা করেছেন।

দেখলাম, তারিখ অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বাড়ি ঘুরে এসেছে বলে পত্র দেরিতে পেয়েছি। ছাপাচিঠির সঙ্গে হাতের লেখা একটি পত্র। আদুভাইর পুত্র লিখেছে, বাবার খুব অসুখ, আপনাকে দেখবেন তাঁর শেষ সাধ।

পড়াশোনা ফেলে ছুটে গেলাম আদুভাইকে দেখতে। এই চার বছর তাঁর কোনো খবর নিইনি বলে লজ্জা-অনুতাপে ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কেঁদে বলল, বাবা মারা গিয়েছেন। প্রমোশনের জন্য তিনি এবার দিনরাত এমন পড়াশোনা শুরু করেছিলেন যে, শয্যা নিলেন তবু পড়া ছাড়লেন না। আমরা সবাই তাঁর জীবন সম্বন্ধে ভয় পেলাম। পাড়াশুদ্ধ লোক গিয়ে হেডমাস্টারকে ধরায় তিনি স্বয়ং এসে বাবাকে প্রমোশনের আশ্বাস দিলেন। বাবা অসুখ নিয়েই পালকি চড়ে স্কুলে গিয়ে শুয়ে-শুয়ে পরীক্ষা দিলেন। আগের কথামতো তাকে প্রমোশন দেয়া হলো। তিনি তাঁর 'প্রমোশন উৎসব' উদ্‌যাপন করবার জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। কাকে-কাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে, তার লিস্টও তিনি নিজহাতে করে দিলেন। কিন্তু সেই উৎসবে যাঁরা যোগ দিতে এলেন, তাঁরা সবাই তাঁর জানাজা পড়ে বাড়ি ফিরলেন।

আমি চোখের পানি মুছে কবরের কাছে যেতে চাইলাম।

ছেলে আমাকে গোরস্তানে নিয়ে গেল। দেখলাম, আদুভাইয়ের কবরে খোদাই করা মার্বেল পাথরের ট্যাবলেটে লেখা রয়েছে :

Here sleeps Adu Mia who was promoted
from Class VII to Class VIII.

ছেলে বলল, বাবার শেষ ইচ্ছামতোই ও-ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত ধানীখোলা গ্রামে ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯শে ভাদ্র) এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে আবুল মনসুর আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহিম ফরাযী এবং মাতার নাম মীর জাহান খাতুন। ধানীখোলা গ্রামে ফরাযী-পরিবারকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারক বলে

মনে করা হতো। গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণই ছিলেন গোঁড়া মুহম্মদি সম্প্রদায়ভুক্ত। এমনই এক ধর্মীয় কড়াকড়ি পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু হয় পাঁচ বছর বয়সে চাচা মুনসি ছমিরুদ্দিনের মক্তবে বাগদাদি কায়দা, আম-সিপারা ও কোরআন শরিফ শিক্ষার মাধ্যমে। ১৯০৬ সালে তিনি জমিদার কাছারিতে পাঠশালায় ভর্তি হন।

১৯০৮ সাল পর্যন্ত এখানে পড়াশোনা শেষে ১৯০৯ সালে দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এখানে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েন। এরপর ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে নাসিরাবাদ শহরের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এ স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে পাঁচ টাকা মুহসীন বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯১৯ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাস করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৯২৯ সালে কলকাতার রিপন ল কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ল পাস করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা খ্যাতনামা গ্রন্থগুলো হলো : 'হুজুর কেবলা', 'নয়াপাড়া', 'আয়না', 'আসমানী পর্দা', 'ফুড কনফারেন্স', 'গালিভারের সফরনামা' ইত্যাদি। ১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

আদুভাই নামে এক ছাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ত। পড়ালেখায় সে ভালো না হলেও চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দায় ছিল সবার উপরে। বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন সবসময় মেনে চলত। কিন্তু সে কখনোই বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করতে পারত না। ফলে বছরের পর বছর সে ক্লাস সেভেনেই থাকত। তার সহপাঠীরা পাস করে কেউ কেউ ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। কেউ অন্যত্র ভালো চাকরি করছে। কিন্তু আদুভাই ঐ ক্লাস সেভেনেই পড়ে আছে। সে প্রমোশনের জন্য কারও কাছে কোনো দিন আবেদন করেনি। কিন্তু একদিন দেখা গেল সে প্রমোশনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। কারণ সে-বছর তার ছেলেও ক্লাস সেভেনে প্রমোশন পেয়েছে। তার স্ত্রীর আপত্তির কারণে সে প্রমোশন পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। এর কিছুদিন পর আদুভাই কঠোর পরিশ্রম করে দিনরাত পড়াশোনা করে অষ্টম শ্রেণিতে প্রমোশন পেয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত খাটুনির ফলে শরীরে শক্ত রোগ বাসা বাঁধে। ফলে কিছুদিন পরেই আদুভাই মারা যায়।

শব্দার্থ ও টীকা

তাচ্ছিল্য – তুচ্ছ জ্ঞান; অশ্রদ্ধা; অবজ্ঞা। **অনাদিকাল** – আদিকাল থেকে; বহুকাল ধরে। **নির্বুদ্ধিতা** – বিশেষ জ্ঞান নেই এমন; নির্বোধ। **থিসিস**– নিবন্ধ; অভিসন্দর্ভ। **বেতমিজ** – অশিষ্ট; বেয়াদব; শিষ্টাচারজ্ঞানবর্জিত। **ভূমণ্ডল** – পৃথিবী; ভূভাগ। **সংস্রব** – সংযোগ; সম্পর্ক; সম্বন্ধ। **পরীক্ষক** – পরীক্ষা করে এমন; পরীক্ষাকারী। **ফ্যাকাশে**– বিবর্ণ; পাণ্ডুবর্ণ; অনুজ্জ্বল; দীপ্তিহীন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. আদু ভাইয়ের নাম শুনে কে জ্বলে উঠল?

ক. বাংলা শিক্ষক খ. মৌলভী সাহেব

গ. প্রধান শিক্ষক ঘ. গণিত শিক্ষক

২. 'আজ হোক, কাল হোক, প্রমোশন আমাকে দিতে হবে– এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে আদু ভাই-এর

i. দম্ভভাব

ii. আত্মবিশ্বাস

iii. দৃঢ় প্রত্যয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

অর্ণব ভালো ছাত্র, কখনই স্কুল ফাঁকি দেয় না। ভালো ছাত্র হিসেবে প্রতিবছর পুরস্কার পায়। সহপাঠীদের পড়াশোনায় সাহায্য করে। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো ক্লাসে তাকে দুবার থাকতে হয়নি।

৩. অর্ণব ও আদুভাই উভয়েই–

ক. ভালো ছাত্র খ. সময়নিষ্ঠ

গ. একই শ্রেণিতে পড়ে ঘ. পরস্পর বন্ধু

৪. উদ্দীপকের অর্ণব ও 'আদুভাই' গল্পের আদুভাই কোন দিক থেকে ভিন্ন?

ক. সময় নিষ্ঠতায় খ. শ্রমবিমুখতায়

গ. কৃতকার্যতায় ঘ. সদালাপীতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাফি এবার দিয়ে পাঁচবার এসএসসি পরীক্ষা দিল। ষষ্ঠবারের পরীক্ষা দেওয়ার সময় পাশে বসা এক সহপাঠী তার খাতা দেখে রাফিকে লিখতে বলল। কিন্তু সে এতে রাজি না হয়ে তাকে বুঝিয়ে বলে যে, 'যতদিন আমার পরীক্ষা পাশের মতো লেখাপড়া হবে না ততদিন অপেক্ষা করব।'

ক. কত মাইল রাস্তা হেঁটে আদু ভাই স্কুলে আসত?

খ. আদু ভাইয়ের অপরাধীর ন্যায় উদ্বেগ কম্পিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. রাফির পাঁচবার এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি 'আদু ভাই' গল্পের আদু ভাই চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'পরীক্ষায় পাশের জন্য রাফি ও আদু ভাইয়ের আদর্শ একই'– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

অলক্ষুণে জুতো

মোহাম্মদ নাসির আলী

অনেক কাল আগের কথা। আলী আবু আম্মুরী নামে একজন ধনীলোক বাস করত বাগদাদ শহরে। শহরের ওপরে তার যেমন ছিল একখানা চমৎকার বাড়ি, তেমনি ছিল যথেষ্ট টাকা-পয়সা। শহরে সবাই তাকে ধনী বলে জানত। কিন্তু বিদেশি কেউ হঠাৎ এসে তার জামা কাপড় দেখে মোটেই ধারণা করতে পারত না যে, লোকটা সত্যিই ধনী।

তার পাড়া পড়শিরা প্রায়ই বলাবলি করত : আলী আবু ধনী হবে না কেন? লোকটা নিজের জন্য একটি দিনারও ব্যয় করে না। চেয়ে দ্যাখো একবার ওর জুতোজোড়ার দিকে, তাহলেই বুঝতে পারবে ও ধনী হয়েছে কী করে। বলেই তারা হাসতে থাকত।

আলী আবুর পায়ের নাগরাই জুতো নিয়ে বাগদাদ শহরের শিশুরা অবধি হাসাহাসি করে। হাসবে না-ই বা কেন? এমন একজোড়া পুরোনো জুতো সারা বাগদাদ শহরে কেউ খুঁজে পাবে না। কেউ কেউ বলে, ও একজোড়া

জুতো পরে আলী আবু জিন্দেগি কাবার করে দিয়েছে।

কিন্তু একজোড়া জুতো কী করে এত দিন টিকতে পারে? হ্যাঁ, আলী আবুর জুতোর কোনো জায়গায় একটি ফুটো হলেই সে বেরোয় মুচির সন্ধানে।

বাগদাদের মুচিরাও তাকে চিনে ফেলেছে। তাকে দেখলেই তারা বলে ওঠে, ওতে আর তালি লাগানো চলবে না সাহেব, ওটা বাদ দিয়ে একজোড়া নতুন জুতো কিনুন।

আলী আবু কিন্তু সে কথায় কান দেয় না। সে আরেক মুচির কাছে যায়। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কেউ হয়তো একটা তালি লাগিয়ে দেয়। এমনি করে আলী আবুর নাগরাই জুতো সবার পরিচিত হয়ে উঠল। এমনকি বন্ধুরা একে অপরকে বলতে লাগল, আলী আবুর নাগরাই জুতোর মতো তোমার পরমায়ু হোক।

কিন্তু অবশেষে সেই বিখ্যাত জুতোই আলী আবুর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠল। শহরের রাস্তায় বেরিয়ে একদিন সে যাচ্ছিল এক কাচের শিশি-বোতলের দোকানের পাশ দিয়ে। দোকানি তাকে দেখে বলে উঠল, এই যে আবু ভাই, আপনার জন্য একটা খোশখবর আছে। বিদেশি এক সওদাগর এসেছে, অনেকগুলো আতরের শিশি বেচতে। চমৎকার রঙিন ফুলকাটা শিশি। মোটে ৫০ দিনার দাম। কিনে এক মাস ঘরে রাখলে তার দাম কম-সে-কম ১০০ দিনার দিয়েই আমি নেব। আমার বদনসিব যে এখন একটি দিনারও হাতে নেই।

অমন লাভের লোভ কে সামলাতে পারে, সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। আলী আবুর রাত-দিন চিন্তাই হচ্ছে, কী করে টাকা বাড়ানো যায়। কাজেই সে তৎক্ষণাৎ রঙিন শিশিগুলো কিনে বাড়ি নিয়ে গেল।

দিনকয়েক পরে আরেক বন্ধু এসে খবর দিল, একটা লোক এসেছে বসরাই গোলাপজল বেচতে। চমৎকার জিনিস কিন্তু দাম একেবারে সস্তা। কিছুদিন পরেই এর দাম দুই গুণ-তিন গুণ হতে বাধ্য। আর তোমার সেই রঙিন শিশি ভর্তি করে বেচলে, চাই কি চার গুণও পেতে পার। আহা কী গোলাপ!

টাকা বাড়ানোর কী অমূল্য সুযোগ। যোগাযোগটা চমৎকার—রঙিন শিশি, তাতে গোলাপজল। আলী আবু ৫০ দিনার দিয়ে গোলাপজল কিনে নিয়ে এলো।

শিশিগুলো গোলাপজলে ভর্তি করে সে যত্ন করে রেখে দিল জানালা বরাবর একটা তাকের ওপর। শিশি-বোতল রাখার পক্ষে এই জায়গাটাই তার বাড়িতে সবচেয়ে নিরাপদ।

অল্প কয়েক দিনের ভেতর দু-দুটো লাভের কারবার করতে পেরে আলী আবুর মন খুশিতে আটখানা।

সেদিন দুপুরবেলা সে শহরের হাম্মামে গিয়ে ঢুকল গোসল করতে। ঠিক সে সময়ে হাম্মাম থেকে গোসল সেরে বেরিয়ে আসছিল ওমর বিন আদি নামে তার এক বন্ধু। আলী আবুকে দেখেই সে বলে উঠল, আস্‌সালামু আলাইকুম, আবু ভাই।

আলী আবু সাথে সাথে জবাব দিল। এমন সময় ওমরের নজর পড়ল আবুর জুতোর ওপর। ধনী বন্ধুর জুতোর এ দুর্দশা দেখে সে মাথা নেড়ে বলল, ভাই আলী আবু, তোমার তো মা-শাল্লাহ টাকা-পয়সার কমতি নেই। একজোড়া নতুন জুতো কেন তুমি কিনছ না ভাই? সারাটা বাগদাদ শহর খুঁজেও তোমার নাগরাই জুতোর শামিল আর একজোড়া জুতো কেউ বের করতে পারবে না। সত্যি বলছি, তোমার এ জুতোকে এবার পেনশন দিয়ে একজোড়া নতুন জুতোর ব্যবস্থা করা উচিত।

এই বলে ওমর বিন আদি মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল। আবু কোনো জবাব না দিয়ে শুধু মুচকি হাসল।

গোসল সেরে কাপড়-জামা পরে আবু বাইরে এসে দেখল, তার জুতোজোড়া জায়গামতো রাখা নেই। আসলে লোকের পায়ের ধাক্কায় দূরে এক বেঞ্চির তলায় দুখানা জুতো দুপাশে পড়ে আছে। আবুর পুরোনো জুতো যেখানে ছিল, সেখানে পড়ে আছে একজোড়া দামি চকচকে নতুন জুতো। চমৎকার জুতো, তাও ঠিক আবুর পায়ের মাপের।

আবু তখন মনে মনে ভাবল, আমার বন্ধু ওমরেরই এ কাজ। সে-ই নতুন জুতোজোড়া কিনে আমাকে উপহার দিয়ে গেছে। এ জন্যই মাথা নাড়ছিল ওমর। প্রাণ খুলে বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবু নতুন জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আসলে আবুর অনুমান কিন্তু মোটেই সত্য নয়। জুতোজোড়া ছিল শহরের কাজির। আবুর মতো তিনিও জুতো ছেড়ে হাম্মামে ঢুকেছিলেন গোসল করার জন্য। বাইরে এসে কাপড় পালটাতে গিয়ে তিনি দেখলেন, জুতো নেই সেখানে। দেখেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, আমার জুতো কী হলো?

কাজির জুতো নিখোঁজ? খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়ে গেল তক্ষুনি। চারদিকে খুঁজে পেতে অবশেষে পাওয়া গেল আলী আবুর রঙবেরঙের তালিওয়ালা সেই নাগরাই জোড়া।

সেই জুতো চিনতে কারও বাকি রইল না। তালিওয়ালা সেই জুতো বাগদাদ শহরের কে না চেনে?

এ জুতো সেই কমবখত আলী আবুর না হয়ে যায় না। আমার নতুন জুতো নিয়ে সে-ই পালিয়েছে। হাতেনাতে এভাবে না ধরলে কে ভাবতে পারে যে, ব্যাটা জুতোচোর? ব্যাটাকে ধরে এনে আচ্ছা সাজা দিতে হবে আজ।

– বলে কাজি চিৎকার করতে লাগলেন।

তারপর লোকজনদের ডেকে পুরোনো জুতো পাঠিয়ে দিলেন আলী আবুর বাড়িতে। তারা গিয়ে দেখতে পেল, সত্যি সত্যি আলী আবুর পায়ে কাজির সেই নতুন জুতো।

আর যায় কোথায়? টানতে টানতে তারা বেচারা আলী আবুকে হাজির করল কাজির দরবারে। কাজি রেগে বললেন, এক্ষুণি ওর পিঠে দশ দোররা মারো। মেরে নিয়ে যাও কয়েদখানায়। হাজার দিনার জরিমানা দিলে তবে ওর মুক্তি।

ব্যাপারটা যে ভুলবশত হয়ে গেছে আবু তা বোঝাতে বারবার চেষ্টা করল। কিন্তু কে শুনবে তখন তার কথা। অবশেষে কেবল এক হাজার দিনার জরিমানা দিয়ে আলী আবু সে যাত্রা রক্ষা পেল।

বাড়ি ফিরে আসতে আসতে সে ভাবল, যে অপয়া জুতোর জন্য এতটা হয়রানি আর বেইজ্জতি, তার মুখ আর জীবনে দেখতে চাইনে। আজ বাড়ি গিয়ে ও-দুটোকে শেষ করতে হবে।

এই ভেবে আবু বাড়ি ফিরে তার নাগরাই জোড়া নিয়ে এল নদীর তীরে। তারপর বাড়ি থেকে বেশ খানিক দূরে একটা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে এক এক করে দু-পাটি জুতোই ছুড়ে ফেলল নদীতে।

কিন্তু সেদিন বিকেলে ঘটল এক কাণ্ড। এক জেলে এসে নদীতে জাল ফেলতেই মাছের পরিবর্তে সশরীরে উঠে

এল আবুর সেই বিখ্যাত নাগরাই জোড়া। হরেক রকমের চামড়ার তালি লাগানো জুতো চিনতে জেলের দেরি হলো না। সেবারের খ্যাপে জালে মাছ না উঠলেও সে কিন্তু মনে মনে খুশিই হলো। বাড়ি ফিরে বউকে বলল, আলী আবু ধনী মানুষ— এতদিনের জুতোজোড়া ফেরত পেলে কম করেও দু-দিনার বকশিশ নিশ্চয় দেবে।

দুঃখের বিষয়, জেলে যখন আলী আবুর বাড়ি জুতো নিয়ে হাজির হলো, তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ। শুধু একটা জানালা খোলা ছিল। তাও ছিল অনেক উঁচুতে। জেলে মনে মনে বলল, এই নিয়ে আর তকলিফ করে ফিরে যাওয়া যাবে না। তার চেয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে দিলেই আবু এসে তার জুতো পেয়ে খুশি হবে। পরে যখন দেখা হবে, তখন বললেই হবে যে, আমি পেয়েছিলাম ওটা। বকশিশটাও তখন চেয়ে নেওয়া যাবে।

এই বলে জানালা দিয়ে জুতো দু-খানা ছুড়ে মারতেই সেগুলো গিয়ে পড়ল গোলাপজলের শিশির ওপর। তার ফলে তাকের সবগুলো শিশি মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

রাতে বাড়ি ফিরে আবুর তো চক্ষু চড়কগাছ। মাথা চাপড়ে সে কেঁদে উঠল। আবার সেই অপয়া জুতোর কীর্তি। কী বদনসিবই হয়েছে আমার। আজই, এক্ষুণিই, এ অলক্ষুণে জুতোর হাত থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে।

এই বলে বাগানের একপাশে দেয়ালের ধারে গিয়ে সে মাটি খুঁড়তে লাগল। আঁধারে তখন কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু কাল ভোর অবধি অপেক্ষা করার মতো মনের অবস্থা আবুর মোটেই নেই। চোর যেমন আঁধারে সিঁধ কাটে আবুও তেমনি আঁধারেই মাটি খুঁড়তে লাগল।

দেয়ালের পাশে শব্দ শুনে পাশের বাড়ির লোকেরা এল আলো নিয়ে। এসে দেখল আবুর কাণ্ড। তারা বলল, এই তোমার কীর্তি! আঁধারে বসে দেয়ালের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে আমাদের সর্বস্ব চুরি করার মতলব? চল এক্ষুণি কাজির কাছে।

এবার কাজি তাকে দেখেই বলে উঠলেন, আবার চুরি! কদিন আগে আমার জুতো চুরি করে জরিমানা দিয়েছ। এবার বুঝি বড় রকমের দাঁও মারবার মতলবে ছিলে?

এই বলে আবুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই কাজি তাকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ি এসে সে ভাবল-দু-বার দুই হাজার দিনার জরিমানা দিয়ে জেল খাটার হাত থেকে রেহাই পেলাম। কিন্তু জুতোর হাত থেকে রেহাই না পেলে চলবে না। এই অলক্ষুণে জুতো বাড়ির বার করতেই হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে এবার সে জুতোজোড়া ফেলে এল নর্দমায়। বাড়ি ফিরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, এতদিনে সত্যিই রেহাই পেলাম। নর্দমায় কেউ জাল ফেলতে আসবে না।

পরের দিন ভোরে ঝাড়ুদার এল নর্দমা পরিষ্কার করতে। এসে দেখল একজোড়া ছেঁড়া জুতো আটকে নর্দমা বন্ধ হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, জুতোর মালিককে চিনতে বেগ পেতে হলো না। ময়লা জুতোজোড়া সে আবুর বাড়ির দরজায় রেখে চলে গেল।

আবুর ঘুম ভাঙতে বাইরে এসে দেখল, আবার সেই জুতো। আবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। এবার কী করবে তাই বসে সে ভাবতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে এক কুকুর যাচ্ছিল ছুটে। হঠাৎ আবুর বাড়ির কাছে এসেই থেমে পড়ল। তারপর মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে এল জুতোর কাছে। এসেই একপাটি জুতো মুখে নিয়ে দে-ছুট।

অগত্যা আবুও ছুটল কুকুরকে তাড়া করে। ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল একটা দেয়াল। কুকুর দেয়াল টপকে যেতেই জুতোটা ফস্‌কে গিয়ে পড়ল দেয়ালের ওপাশে একটা ছোট ছেলের মাথায়। আবুর ভারী জুতোর ঘায়ে ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাড়িতে হইচই পড়ে গেল। সবাই এল ছুটে।

তারপর আবার সেই কাজির দরবার। আবুকে দেখে কাজি রেগে উঠে বললেন, ছেলেটার চিকিৎসার সব টাকা তো দিতেই হবে, তা ছাড়া সমপরিমাণ টাকা খেসারতও দিতে হবে।

বেচারা এবার কেঁদেই ফেলল। দুবার জরিমানা আর শিশির কারবারে লোকসান দিয়ে আবুর হাতে নগদ টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। তাই এবার তাকে ধাক্কা সামলাতে হলো বন্ধুবান্ধবের কাছে ধার করে।

এ ঘটনার দিন-দুই পরে আবু এসে হাজির হলো কাজির দরবারে। কাজি তো তাকে দেখেই অবাক। সেদিকে লক্ষ না করে তালি দেওয়া জুতোজোড়া কাজির সামনে রেখে আবু বলল, এবার আমার ফরিয়াদ রাখতে হবে হুজুর। আমার এই জুতোজোড়ার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ। এ অলক্ষুণে জুতোর কারণে আমার যা কিছু দুর্ভোগ ঘটেছে, তা শুনে হক ইনসাফ করুন, করে দোষীর সাজা দিন।

কাজি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লোকটা তামাশা করছে না কি! আবু আবার বলতে লাগল, আমি সত্যি বলছি হুজুর। আমার বুড়োবয়সে সবকিছু দুর্ভোগের মূল ওই ছেঁড়া জুতোজোড়া। এ দুটোকে এমনভাবে কয়েদ করে রাখুন যাতে আমার নজরে আর না পড়ে।

এই বলে সে একে একে কাজিকে সব কথা খুলে বলল।

আবুর দুর্ভোগের কথা শুনে কাজির ভীষণ হাসি পেল। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, সত্যিই তুমি জুতোর বদৌলতে কষ্ট ভোগ করছ দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমার জরিমানার টাকা সব ফেরত দেওয়ার হুকুম দিলাম। তা ছাড়া এ জুতো আর তোমাকে দেখতে হবে না।

কাজি সত্যিই দয়ালু ছিলেন। তিনি আবুর দুই হাজার দিনার সাথে সাথে ফেরত দিয়ে দিলেন। জুতোজোড়ার ভাগ্যে কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আবুর পায়ে সেগুলোকে আর দেখা যায়নি।

লেখক-পরিচিতি

১৯১০ সালের ১০ই জানুয়ারি মোহাম্মদ নাসির আলী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ধাইদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হায়দার আলী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তেলিরবাগ কালীমোহন-দুর্গামোহন ইনস্টিটিউট থেকে এন্ট্রান্স (১৯২৬) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিকম (১৯৩১) পাস করেন। তারপর চাকরির সন্ধানে কলকাতায় যান। ১৯৩৩ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে অনুবাদক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিশু বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় এসে হাইকোর্টের চাকরিতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে অবসরে যান। অবশ্য এর আগেই ১৯৪৯ সালে তিনি নওরোজ কিতাবিস্তান নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং পুস্তক ব্যবসা চালিয়ে যান। ১৯৫২ সালে দৈনিক আজাদের শিশু-কিশোর বিভাগে 'মুকুলের মাহফিল' পরিচালনা করেন এবং 'বাগবান' ছদ্মনামে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন।

শিশুতোষ গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবেই নাসির আলীর মুখ্য পরিচয়। তবে তিনি শিক্ষামূলক গল্প, প্রবন্ধ ও জীবনীও রচনা করেন। নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : 'মণিকণিকা' (১৯৪৯), 'শাহী দিনের কাহিনী' (১৯৪৯), 'ছোটদের ওমর ফারুক' (১৯৫১), 'আকাশ যারা করলো জয়' (১৯৭৫), 'আলী বাবা' (১৯৫৮), 'ইতালির জনক গ্যারিবল্ডি' (১৯৬৩), 'বীরবলের খোশ গল্প' (১৯৬৪), 'সাত পাঁচ গল্প' (১৯৬৫), 'বোকা বকাই' (১৯৬৬), 'যোগাযোগ' (১৯৬৮), 'লেবু মামার সপ্তকাণ্ড' (১৯৬৮) ইত্যাদি। সাহিত্যের জন্য তিনি ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান। ১৯৭৫ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

অনেক দিন আগে আলী আবু আম্মুরী নামে এক ধনীলোক বাগদাদ শহরে বাস করত। কিন্তু সে খুবই সাধারণ পোশাক পরত। সে তার জুতাজোড়া দীর্ঘদিন ধরে জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহার করত। ফলে তার ব্যবহৃত জুতাজোড়া সবাই চিনত। সবার চেনা এই জুতাজোড়াই কাল হলো তার। একবার ভুল করে জুতা চুরির দায়ে তাকে জরিমানা দিতে হয়। রাগে-দুঃখে তা নদীতে ফেলে দিলে জেলে তার জালে জুতাগুলো পায়। যেহেতু আবুর জুতা প্রায় সবাই চিনত, কাজেই সেও চিনল। ফেরত দিতে গিয়ে সে বাড়িতে কাউকে না পেয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে মারে ঘরের ভেতর। এতে আবুর ব্যবসার জন্য রাখা গোলাপজলের শিশি-বোতল ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আবার এ জুতা মাটিতে পুঁতে ফেলতে গেলে সিঁধেল চোর হিসেবে ধরা পড়ে জরিমানা দিতে হয়। নর্দমায় ফেলে দিলে ঝাড়ুদার তা এনে বাড়ির দরজার সামনে রেখে যায়। কুকুর একপাটি জুতা নিয়ে পালিয়ে গেলে তা এক ছেলের মাথায় পড়ে দুর্ঘটনা ঘটে। এতেও তাকে জরিমানা দিতে হয়। এভাবে আবু এ জুতার জন্যই অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অবশেষে কাজির কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললে কাজি সাহেব তাকে জরিমানা থেকে মুক্তি দেন।

শব্দার্থ

বাগদাদ — ইরাকের রাজধানী; শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শহর। **দিনার** — ইরাকের মুদ্রার নাম। **জিন্দেগি** — সারা জীবন। **কাবার** — শেষ। **কান দেওয়া** — শোনা। **পরমায়ু** — দীর্ঘ জীবন। **খোশ খবর** — সুসংবাদ। **সওদাগর** — ব্যবসায়ী। **বদনসিব** — মন্দ ভাগ্য। **বসরা** — ইরাকের একটি বাণিজ্যিক শহর। **কারবার** — ব্যবসা। **খুশিতে আটখানা** — খুবই আনন্দিত। **হাম্মাম** — গোসলখানা; স্নানাগার। **পেনশন দিয়ে** — বাদ দিয়ে বা প্রত্যাখ্যান করা অর্থে। **সাড়া পড়ে গেল** — আলোড়ন সৃষ্টি হলো অর্থে। **কমবখত** — হতভাগ্য, দুর্ভাগা; বুদ্ধিহীন। **দরবার** — বিচারালয়। **সে যাত্রা** — সে সময়; সে-বার। **নাগরাই** — চামড়ার একপ্রকার জুতো। **হরেক রকম** — বিভিন্ন রকম। **তকলিফ** — কষ্ট; দুর্ভোগ। **অপয়া** — অমঙ্গলজনক; অশুভ; অলক্ষণা; কুলক্ষণা। **সর্বস্ব** — সবকিছু। **মতলব** — ফন্দি। **দাঁও মারা** — সহজে মোটা লাভ করা। **খেসারত** — ক্ষতিপূরণ। **ফরিয়াদ** — প্রার্থনা। **মামলা-মোকদ্দমায়** — আদালতে অভিযোগ। **ইনসাফ** — বিচার; ন্যায়বিচার।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ওমরের সাথে আবুর কোথায় দেখা হলো?
   ক. রাস্তায় খ. হাম্মামে
   গ. নদীর তীরে ঘ. কাজির দরবারে

২. আবু কার জুতো পায়ে দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল?
   ক. বন্ধুর খ. মুচির
   গ. কাজির ঘ. সওদাগরের

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গুপ্তধনের লোভে দীপু রাতের অন্ধকারে প্রতিবেশির বাগানের মাটি খুঁড়তে লাগল। টের পেয়ে তারা পুলিশকে জানালো। সন্দেহজনক কার্যকলাপের দায়ে সেই রাতেই গ্রেফতার হলো সে।

৩. কোন কাজের জন্য আলী আবু আর উদ্দীপকের দীপু একই সুতোয় বাঁধা?
   ক. গুপ্তধনের লোভ খ. মাটি খোঁড়ার কাজ
   গ. জুতা চুরি ঘ. নতুন জুতা ক্রয়

৪. কোন উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে উভয়ের কাজটি ভিন্ন ?
   ক. চুরি করার খ. লজ্জা লুকানোর
   গ. প্রচুর লোভ ঘ. জুতা বিক্রির

সৃজনশীল প্রশ্ন

রাজার হয়েছে ভীষণ অসুখ। কবিরাজ-বদ্যির ঔষুধে কোনো কাজ হচ্ছে না। অবশেষে একজন দিল মোক্ষম দাওয়াই। সুখী মানুষ খুঁজে বের করে তার জামা এনে পরাতে হবে রাজাকে। রাজ্যজুড়ে খোঁজ করে সুখী মানুষ একজন পাওয়া গেল বটে কিন্তু তার কোনো জামা ছিল না। তাই রাজার বালাই দূর হলো না।

ক. আলী আবু জেলখাটা থেকে রেহাই পেতে মোট কত দিনার জরিমানা দিয়েছিল?

খ. 'কিন্তু আবুর পায়ে সেগুলোকে আর দেখা যায়নি'– কেন?

গ. রাজা ও আলী আবুর সমস্যার মধ্যে সাদৃশ্য নির্দেশ কর।

ঘ. 'সুখী মানুষের জামা কাল্পনিক দাওয়াই হলেও আলী আবুর জুতো বাস্তবিক বালাই'– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

উনিশ শ একাত্তর

ইমদাদুল হক মিলন

একদিন দুপুরবেলা দীনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। একাত্তর সালের কথা। বর্ষাকাল ছিল সেদিন, টানা দশ দিন পর দীনুদের ছোট্ট মফস্বল শহরে দুপুরের দিকে রোদ উঠেছে। এক দিন ছিল বৃষ্টি। ঘোর বৃষ্টি। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। আকাশ ছিল পোড়ামাটির চুলোর মতো। থেকে থেকে মেঘ ডেকেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে। আর বৃষ্টি। কেমন বৃষ্টি। শহরের চারদিকে ছিল বর্ষার জল। জলের ওপর মাইলকে মাইল ভেসে ছিল আমন ধান। ধানে তখন থোড় আসার সময়। বৃষ্টি ছিল, বাতাস ছিল না বলে বৃষ্টির তলায় ধানী মাঠগুলো ছিল স্বপ্নের মতো স্থির। সুবলদের বাড়িটা শূন্য পড়ে আছে অনেক দিন। বর্ষার মুখে সুবলরা বাড়ি ছেড়ে গেল। যাওয়ার দিন সকালবেলা সুবলের বুড়ি দিদিমা দীনুকে ডেকে বললেন, 'আমরা চলে যাচ্ছি দীনু'। তারপর আঁচলে চোখ মুছলেন।

দীনু কিছু বুঝতে পারে না। দিদিমার চোখে জল দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর টের পায় নিজের চোখও জলে ভরে আসছে তার। দীনু ছেলেটা এই রকম। কারও চোখের জল সইতে পারে না। জন্মের পর সে দেখেছে এই মফস্বল শহর, এই সব মানুষজন। জগৎ সংসারে তার আপন কেউ নেই বলে এই শহরের সবাই তার বড় আপন। কাউকে দীনু ডাকে বাবা, কাউকে মা, ভাইবোন, দিদিমা, জ্যাঠা, চাচা, মামা, খালা, পিসি—আত্মীয়ের অভাব নেই দীনুর। আর নিজের কোনো বাড়িঘর নেই বলে এই শহরের সবগুলো বাড়িঘরই দীনুর নিজের। যখন সে ইচ্ছে বাড়ি যায়। খিদে থাকলে সোজা গিয়ে ঢোকে রান্নাঘরে। ঘুম পেলে যে কোনো বিছানায় ফাঁক-ফোকর দিয়ে গুটিশুটি শুয়ে পড়ে। দীনুকে কেউ কখনো ফেরায় না।

দীনুর বয়স দশ বছর। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কখনো ওর সঙ্গে রাগ করতে পারে না। দশ বছর বয়সে দীনুও যেন কেমন করে কথাটা জেনে গেছে।

কিন্তু একটা কথাই দীনুর জানা হয়নি- দীনু হিন্দু না মুসলমান! কেমন করে যে এই শহরে এসেছিল, কার কোলে কেউ তা জানে না। যদিও এ নিয়ে দীনুর কোনো দুঃখ নেই। সুখ আছে। দশ বছরের জীবনেই দীনু জেনে গেছে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ। সে কোন ভাগে?

দীনু জানে না। সুখটা এই। অবাধে সে হিন্দু বাড়ি যায়। মাসি পিসি ডাকে। পেটপুরে খায়, ঘুমায়। যায় মুসলমান বাড়ি। খালা ফুফু ডাকে। পেটপুরে খায় ঘুমায়। দীনুর কোনো দুঃখ নেই।

তো সুবলের দিদিমা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'দীনুরে আমরা কলকাতা যাচ্ছি।'

'কোথায় দিদিমা?'

'কলকাতা।'

কলকাতা কোথায়, দীনু জানে না। তার মনে হয় এই শহরের আশপাশেই হবে কলকাতা, দিদিমারা বোধ হয় আত্মীয়-বাড়ি যাচ্ছে বেড়াতে। দু-পাঁচ দিন পর ফিরে আসবে।

কিন্তু দিদিমা তাহলে কাঁদে কেন? দীনু তখন সারা বাড়ির লোকজনের মুখ দেখে। কেমন থমথমে দুঃখী মুখ সবার। আর কত যে বোচকা-বুচকি। খাট-পালঙ্ক আর ভারী জিনিসপত্র ছাড়া সবই নিয়ে যাচ্ছে সুবলরা। আত্মীয়-বাড়ি গেলে কেউ কি অত জিনিসপত্র নিয়ে যায়?

দীনুর মাথার ভেতর বড় রকমের একটা গিঁট লেগে যায়। গিঁট খুলতে দীনু যায় সুবলের কাছে।

সুবল দীনুর বয়সী। হলে হবে কী, সুবলটা বড় বুদ্ধিমান। স্কুলে পড়ে তো।

'জানিস না দেশে গণ্ডগোল লেগেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কত মিলিটারি এসেছে। মিলিটারিরা সব মানুষ মেরে ফেলবে। ইয়া বড় বড় বন্দুক আছে।'

শুনে দীনু খুব ভয় পেয়ে যায়। 'হায় হায়, তাহলে!'

'তাহলে আর কি! আমরা তো এ জন্যই চলে যাচ্ছি।'

তখন দীনু একটা আবদার করে বসে। 'সুবল আমাকে নিবি?'

'যাঃ, তোকে কোথায় নেব।'

এ কথা শুনে সুবলের দিদিমা এগিয়ে আসেন। তারপর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দীনুর মাথায় হাত রাখেন। 'দীনু দাদারে, মন খারাপ করিসনে। ওখানে আমাদেরই কোনো ঠাঁই-ঠিকানা নেই। থাকলে তোকে নিয়ে যেতাম।'

তারপর আবার আঁচলে চোখ ঢাকেন। দেখে দীনু এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে।

দিদিমা বললেন, 'আমাদের এই বাড়িটা তোকে দিয়ে গেলাম। তোর তো কোথাও থাকার জায়গা নেই। এখানে

থাকিস। একা থাকতে ভয় লাগলে কাউকে নিয়ে থাকিস।ঘরে চাল-ডাল সব আছে। তোর ছয় মাস চলবে। আর শোন দাদু, তোর ভয় নেই। তুই খুব ভালো ছেলে। তোকে পাকিস্তানি সেনারা কিছু করবে না। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ফিরে আসব।'

'দেশ স্বাধীন মানে?'

এত দুঃখের মধ্যেও সুবলের দিদিমা হেসে ফেলেন। 'এই দেশটা পূর্ব বাংলা, আর পূর্ব বাংলা থাকবে না। হবে বাংলাদেশ।'

দীনু হয়তো আরও কিছু জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু তার আগে খালপাড়ে বিরাট ছইওয়ালা নৌকা এসে ভিড়ল। বোচকা-বুচকি নিয়ে সুবলরা সব নৌকায় গিয়ে উঠল। দীনু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খালপাড়ে। তারপর যতক্ষণ সুবলদের নৌকা দেখা যায়, ততক্ষণ কতবার যে চোখের জল মুছল, গোনাগুনতি নেই।

সেই দিনটা বড় খারাপ কেটেছে দীনুর। সারা দিন কিছু খায়নি। সুবলদের বাড়ির তিনটে ঘরের চাবিই দীনুকে দিয়ে গিয়েছিলেন সুবলের দিদিমা। কিন্তু দীনু শুধু খুলেছিল বাংলাঘরের তালা।

সুবলদের বাংলাঘরে পুরোনো কালের বিশাল একটা চৌকি পাতা। ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে। সেই চৌকিতে সারা দিন শুয়ে থেকেছে দীনু। জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আকাশ দেখেছে। সুবলদের কথা ভেবেছে, আর মিলিটারিদের কথা। মিলিটারিরা সত্যি কি সব লোকজন মেরে ফেলবে তাহলে?

এত ভাবতে ভাবতে দীনু ঘুমিয়ে পড়েছে কখন যে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দীনু খুব ভয় পেয়ে গেল। প্রথমে খানিকক্ষণ সে বুঝতে পারে না, কোথায় শুয়ে আছে। যখন বুঝতে পারল সুবলদের বাংলাঘরে-ভয়টা শুরু হলো তখুনি।

সুবলদের বাড়িতে বিশাল তিনটা ঘর। বাড়ির পেছনে ফলফলারির গহিন বাগান। একটা বাঁধানো পুকুর। তার ওপর কাছে পিঠে কোনো বাড়ি নেই। এই রকম একটা বাড়িতে দীনু একলা। সারা দিন কিছু খায়নি। তবুও খিদে টের পায় না। চোখ বন্ধ করে খোলা জানালার পাশে পড়ে থাকে দীনু।

শেষরাতে একটুখানি চাঁদ উঠেছিল বলে, জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল বলে রক্ষে। রাতটা দীনুর কেটে যায়। নয়তো কী যে হতো, দীনু হয় তো সেদিন....

পরদিন বাজারে গিয়ে জমির চাচাকে ধরে দীনু। জমির বাজারের কোণে বসে ভিক্ষে করে। ভালো মানুষ। তবুও লোকে বলে জমির পাগলা। দীনু ডাকে জমির চাচা।

সেই জমির চাচাকে পটিয়ে এল দীনু। তোমার তো কোথাও থাকার জায়গা নেই, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে সুবলদের বাংলাঘরে থাকবে। সুবলরা কেউ বাড়ি নেই। আমি এখন সুবলদের বাড়ির মালিক।

সুবলদের চলে যাওয়ার কথা, দেশে গণ্ডগোল, মিলিটারিদের কথা আর সুবলের দিদিমার মুখে শোনা স্বাধীনতার কথা সবই জমির চাচাকে বলে দীনু। জমির চাচা চমৎকার লোক। দীনুর কথায় রাজি না হয়ে কি পারে?

সেই থেকে জমির চাচা আর দীনু দুজনে সুবলদের বাংলাঘরে থাকে রাতের বেলা। দিনের বেলাটা দীনুর

কাটে এ বাড়ি-ও বাড়ি করে। জমির চাচা থাকে বাজারে। সুবলের দিদিমা বলে গিয়েছিলেন, 'ঘরে চাল ডাল সব আছে। রান্না করে খাস দীনু। তোর ছয় মাস যাবে।'

কিন্তু দীনু বড় ঘরটা খোলেনি। দীনু রান্না করতে জানে না। চাল-ডাল তেমনি আছে। আজ দুই মাস। কিন্তু আজই আবার দীনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরের দিকে দশ দিন পরে রোদ উঠেছে দেখে দীনুর খুব ফুর্তি। লাফাতে লাফাতে গেছে খোকনদের বাড়ি। খোকনকে নিয়ে আজ খালের জলে খুব সাঁতার কাটবে ভেবেছে। কিন্তু খোকনদের বাড়ি গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

খোকনদের বাড়িতে কেমন একটা সাজ সাজ রব। খোকনের সব ভাইবোন জামাকাপড় পরে ছুটোছুটি করছে। খোকনের মা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছেন, একে এক কথা বলছেন ওকে আরেক কথা। খোকনদের বাড়ির সঙ্গেই খাল, সেখানে একটা বড় ছইঅলা নৌকা বাঁধা। মাঝিরা খোকনদের সব বোচকা-বুচকি নৌকায় তুলছে। কী ব্যাপার, খোকনেরা সব যায় কোথা?

দীনু অবাক হয়ে খোকনের মাকে জিজ্ঞেস করে, 'খালা, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

খোকনের মা দুঃখী গলায় বললেন, 'বকুলতলী যাচ্ছিরে দীনু। আমার বড় ভাইয়ের বাড়ি।'

'কেন'?

'ওমা তুই জানিস না, শহরে মিলিটারি এসে গেছে। সবাই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। মিলিটারি সব লোকজন মেরে ফেলবে।'

দীনু ভয় পেয়ে বলল, 'তাই নাকি, কবে এসেছে?'

'কাল সন্ধ্যায়। হাই স্কুলে ক্যাম্প করেছে। বৃষ্টি-বাদলা ছিল বলে বেরোয়নি। আজ রোদ উঠেছে, দেখবি খানিক বাদেই বেরুবে। তারপর যাকে পাবে তাকেই মারবে। তুইও চলে যা কোথাও।'

দীনু অবাক হয়ে বলল 'আমি কোথায় যাব? এই শহরের বাইরে আমার কোনো চেনা মানুষ নেই। কার কাছে যাব।'

খোকনের মা একটু রাগী। এই শহরে এই একজন মানুষ, দীনু যাকে খুব ভয় পায়। তবুও এই মুহূর্তে সাহস করে বলল, 'খালা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে নেবে?'

'কোথায়?'

'বকুলতলী'।

শুনে খোকনের মা একটু গম্ভীর হয়ে যান। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'বাবা দীনু, আমার ভাই খুব গরিব মানুষ। বাড়িতে একটা ঘর। তার বড় সংসার, ঘরে জায়গা হয় না। তার ওপর আমরা এতগুলো লোক। কোথায় থাকব, কেমন করে থাকব জানি না। এই অবস্থায় তোকে কেমন করে নেব বাপ।'

খোকনের মা আঁচলে চোখ মোছেন। দেখে দীনুরও চোখ ভরে আসে জলে।

খোকনের মা দীনুর মাথায় হাত রাখেন। 'মন খারাপ করিস নে বাপ। আমি দোয়া করি, তোর কিচ্ছু হবে না। এত সুন্দর ছেলে তুই, এত ভালো। তোর গায়ে কেউ হাত দেবে না।'

তারপর নৌকায় গিয়ে ওঠেন। খোকনেরা সব আগেই নৌকায় উঠে বসেছিল, মা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝিরা বৈঠা ফেলল খালের জলে। বিষণ্ন দীনু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল খালপাড়ে সাদা বেলে মাটির ওপর।

তখন সেই মফস্বল শহরে চমৎকার রোদ। চারদিকের শূন্য বাড়িঘর রোদের আলোয় ঝকমক করছে। খালের জলে, বর্ষার ধানী মাঠে রোদ আর হাওয়ার খেলা। কাছে কোথাও কোনো ধানী মাঠের ভেতর নেমেছে কোড়া পাখি। তার কুরকুর একটানা ডাক শোনা যায়। খালপাড়ে দাঁড়িয়ে দীনু ভাবে- সবারই কোথাও না কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। কেবল তার নেই।

বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে দীনুর। তারপর মন খারাপ করে খালপাড় ধরে একাকি হাঁটতে থাকে। কোথাও কোনো লোকজনের চিহ্ন নেই, সাড়া নেই। দিনের বেলাটাকে মনে হয় রাত দুপুর। সবাই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু দীনু এখন কোথায় যাবে?

তখন জমির চাচার কথা মনে পড়ে দীনুর। জমির চাচা সকালবেলা বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই বাজারের কোণে বসে ভিক্ষা করছে। দীনু ভাবে, জমির চাচাকে গিয়ে মিলিটারির কথা বলবে। তারপর জমির চাচার সঙ্গে কোথাও চলে যাব। জমির চাচার নিশ্চয় কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। আর জমির চাচা যদি যায়, দীনুকে ফেলে যেতে পারবে না।

কিন্তু তারপরই দীনুর মনে হয়, শহরের কোথাও কোনো লোক নেই আজ। বাজার কী বসেছে? সবাই পালালে দোকানিরাও পালাবে। আর দোকানিরা পালালে জমির চাচাও পালাবে। কিন্তু দীনুকে ফেলে কি জমির চাচা পালাতে পারে? দুই মাস ধরে একসঙ্গে আছে।

দীনুর মাথার ভেতর ছোটখাটো একটা গিট লেগে যায়।

খালের ওপারেই হাই স্কুল। জমির চাচার কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলের কাছাকাছি এসে গেছে, তখন ঠিক তখনি মিলিটারির মধ্যে একজন তার নিশানা ঠিক আছে কি না দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। অটোমেটিক রাইফেলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই দীনু দেখে একের পর এক আগুনের মৌমাছি ছুটে আসছে তার দিকে। আর মাথার ওপর সারা শহরের কাক কা কা করছে।

দুই হাতে বুক চেপে ধরে দীনু। দেখে দশ আঙ্গুলের ফাঁকফোকড় দিয়ে জোয়ারের জলের মতো নেমে যাচ্ছে রক্ত। খালপাড়ের সাদা মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে।

আস্তে-ধীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দীনু। চোখ দুটো ভীষণ টানছিল তার। তখুনি দৃশ্যটা দেখতে পায় ও। তার বুকের রক্তে তৈরি হয়েছে বিশাল লম্বা এক খাল। সেই খাল বেয়ে ফিরে আসছে হাজার হাজার ছইঅলা নৌকা। প্রথম নৌকায় সুবলরা। সুবলের বুড়ি দিদিমা বসে আছেন ছইয়ের ভেতর। তার পেছনের নৌকায় খোকনরা। প্রতিটি নৌকা থেকে ভেসে আসছে উল্লাসের শব্দ। দেখে দীনুর যে কী খুশি! সবাই ফিরে আসছে। তাহলে এই কি স্বাধীনতা! সুবলের দিদিমা বলেছিলেন।

স্বাধীনতার কথা ভেবে দীনুর ঠোঁটে বাংলাদেশের মানচিত্রের মতো সুন্দর এক টুকরো হাসি ফুটেছিল। কেউ তা দেখেনি।

লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। তিনি ১৯৫৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গিয়াস উদ্দিন খান এবং মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। তাঁর পৈতৃক বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পাশা গ্রামে।

ঢাকার গেন্ডারিয়া হাইস্কুল থেকে তিনি এসএসসি পাস করেন। এইচএসসি ও অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে।

তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত ১৯৭৩ সালে। গল্পের নাম ছিল 'বন্ধু'। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ১৪০। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : নূরজাহান, পরাধীনতা, পরবাস, ভূমিপুত্র, কালোঘোড়া, নিরন্নের কাল, দেশভাগের পর ইত্যাদি।

তিনি ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন।

পাঠ-পরিচিতি

মফস্বল শহরে বাস করে অনাথ দীনু। সে হিন্দু না মুসলমান সে কথা জানে না। কেমন করে এই শহরে এসেছে তাও সে জানে না। তার বাবা-মা কে, তাদের পরিচয় কী, কিছুই তার জানা নেই।

দীনুর বয়স দশ বছর। তার মুখ ও চোখ দুটো খুব সুন্দর। পৃথিবীতে তার আপন কেউ নেই বলে শহরের সবাই তাকে ভালোবাসে এবং আদর করে।

শহরের সব বাড়িতে দীনুর অবাধ যাতায়াত।সে কাউকে বাবা ডাকে, কাউকে ডাকে মা। এই শহরে ভাইবোন, দিদিমা, জ্যাঠা, চাচা, মামা, খালা, পিসি ইত্যাদি আত্মীয়ের অভাব নেই তার। ঘুম পেলে যে কোনো বাড়ির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। দীনুকে কেউ বাধা দেয় না।

উনিশ শ একাত্তর সালের বর্ষাকালে এক দুপুরবেলা। টানা দশ দিন বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে। ইতোমধ্যে সুবলরা পরিবারের সবাইকে নিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের ভয়ে চলে গেছে কলকাতায়। যাওয়ার সময় সুবলের দিদিমা দীনুকে তাদের শূন্য ঘরে থাকতে বলে গেছেন।

দীনু সুবলদের সাথে কলকাতায় যেতে চেয়েছিল। কিন্তু দিদিমা দীনুকে সাথে নেয়নি। কারণ ওখানে ওদেরই ঠিকমতো থাকার বন্দোবস্ত নেই।

সুবলরা কলকাতা চলে যাওয়ার পর দীনু তাঁদের শূন্য ঘরে গিয়ে থাকে। একা থাকতে ভয় লাগে বলে জমির চাচা আর দীনু দুজনে রাতের বেলা থাকে। দীনু জমির চাচার কাছে বলে সুবলদের চলে যাওয়ার কথা, মিলিটারিদের কথা এবং সুবলের দিদিমার মুখে শোনা স্বাধীনতার কথা।

রোদ উঠার পর দীনু গিয়েছিল খোকনদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখে খোকনরা সবাই মিলিটারিদের ভয়ে একসাথে তার বড় মামার বাড়ি বকুলতলী চলে যাচ্ছে। দীনু ওদের সাথে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু খোকনের মা নিতে সম্মত হননি।

খোকনরা মিলিটারিদের ভয়ে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দীনুর যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বলে সে শহরেই থাকে। খোকনরা বড় নৌকায় করে চলে যায়।

দীনু খালের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে সবারই কোথাও না কোথাও যাওয়ার জায়গা আছে। অথচ তার কোনো জায়গা নেই। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে দীনুর। সে জমির চাচার খোঁজে চলে যায় বাজারে। দীনু দেখে, শহরে কোথাও কোনো মানুষ নেই। সবাই ভয়ে পালিয়েছে।

দীনু জমির চাচার কথা ভাবতে ভাবতে হাইস্কুলের কাছাকাছি আসে। ঠিক তখনই মিলিটারিদের একজন নিশানা ঠিক আছে কি না দেখার জন্য খালের ওপার থেকে দীনুকে তাক করে। গুলিবিদ্ধ দীনু মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে সে দেখে তার রক্তের খাল দিয়ে সুবল ও খোকনরা ফিরে আসছে আনন্দের সাথে। সাথে এসেছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

শব্দার্থ ও টীকা

একাত্তর সাল– উনিশ শ একাত্তর সাল, যে বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ হয়েছিল। মফস্বল শহর– ছোট শহর। পোড়ামাটির চুলো– মাটির চুলা পুড়ে যেমন কালো হয়ে যায়; মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিল তেমনি কালো। আমন ধান–হেমন্তকালীন ধান; বা এক বিশেষ রকমের ধান। থোড়– ফুল বের হওয়ার পূর্বে ধান গাছের ডগা মোটা হয়। এই অবস্থার নাম থোড়। ধানী মাঠ– যে মাঠ ধানে ভরা। স্বপ্নের মতো স্থির– স্বপ্ন যেমন চলাচল করে না তেমন। ভ্যাবাচ্যাকা– বোকা বনে যাওয়া। জগৎ সংসারে– পৃথিবীতে। গুটিশুটি– জড়োসড়ো। অবাধে– বিনা বাধায়। পেট পুরে– পেট ভরে। কলকাতা– ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের রাজধানী শহর। উনিশ শ একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু বাঙালি এই শহরে আশ্রয় নিয়েছিল। থমথমে– গম্ভীর। বোচকা-বুচকি– কাপড়চোপড় ও জিনিসপত্রের বান্ডিল। পালঙ্ক– দামি ও নকশা করা খাট। গিঁট– বাঁধন বা জটিল। পশ্চিম পাকিস্তান – ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এক অংশের নাম হয় পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানের ছিল দুটি অংশ- একটি অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান। অন্যটি পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। মিলিটারি– সেনাবাহিনী। আবদার– বায়না বা অদ্ভুত দাবি। ঠাঁই-ঠিকানা–থাকার জায়গা। স্বাধীন– নিজের অধীন; পরাধীনতা মুক্ত হওয়া। পূর্ববাংলা– অখণ্ড বাংলার পূর্ব অংশ। গোনাগুনতি– হিসাব-নিকাশ। বাংলাঘর– বৈঠকঘর। ফলফলারি– বিভিন্ন ধরনের ফল। গহিন– গভীর। বাঁধানো পুকুর– যে পুকুরের ঘাট বাঁধানো থাকে। ক্যাম্প– সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ঘাঁটি। বড় সংসার– অনেক সদস্যের পরিবার। বিষণ্ন– দুঃখিত; ম্লান। কোড়া পাখি– বিশেষ ধরনের পাখি। কুরকুর– কোড়া পাখির ডাক। বুক কাঁপিয়ে– গভীর কষ্টে। নিশানা– দিক নির্দিষ্ট; লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা। তাক– লক্ষ্য করা। অটোমেটিক রাইফেল– স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। আগুনের মৌমাছি– বন্দুকের গুলি। লম্বা– দীর্ঘ। উল্লাস– আনন্দ; আহ্লাদ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কুরকুর করে কোন পাখি ডাকে?
ক. কুররা খ. ডাহুক
গ. কোড়া ঘ. চিল

২. কোনটি হেমন্তকালীন ধান ?
ক. আউশ খ. আমন
গ. বোরো ঘ. ইরি

৩. সুবলদের বাড়িতে আছে-
i. বিশাল তিনটা ঘর
ii. ফলফলারির গহিন বাগান
iii. একটা বাঁধানো পুকুর

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এদেশের মুক্তিযুদ্ধে জোয়ান-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ছাড়াও অসংখ্য শিশু-কিশোর প্রাণ দিয়েছে। তাদের রক্তে লাল হয়েই সবুজ জমিনের ওপর ওঠে এসেছে স্বাধীনতার সূর্য।

৪. উনিশ শ একাত্তর সালে কোন শিশু প্রাণ দিয়েছে?
ক. সুবল খ. খোকন
গ. দীনু ঘ. জমির

৫. দীনুর চোখে স্বাধীনতার দৃশ্যে ফুটে ওঠে-
i. বিশাল লম্বা এক খাল
ii. হাজার হাজার ছইঅলা নৌকা
iii. সুবলের বুড়ি দিদিমা

নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i,ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১৯৭১ সনের মে মাসের মাঝামাঝি এক বিকেলে আকুয়া প্রাইমারি স্কুলের সামনে এসে দাঁড়ালো জলপাই রঙের তিনটি ট্রাক। বুট পায়ে লাফিয়ে নেমে এলো পাকিস্তানি আর্মি আর দখল করে নিয়ে ঘাঁটি বানিয়ে ফেললো স্কুল ঘরটাকে। দলবল নিয়ে স্কুল মাঠে খেলছিল এই স্কুলের ছাত্র সাত বছরের শ্যামল। আর্মি দেখে আড়ালে লুকিয়ে গেল সবাই।

ক. খোকনরা কোথায় চলে গেল?

খ. সুবলরা কলকাতা যাচ্ছে কেন?

গ. উদ্দীপক 'উনিশ শ একাত্তর' গল্পের যে বিষয়টুকু ধারণ করেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. দীনু 'উনিশ শ একাত্তর' গল্পের প্রাণ আর উদ্দীপকে শ্যামল তার একটি কণামাত্র– কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।

বিচার নেই

আমীরুল ইসলাম

বাদশাহর কঠিন অসুখ। সারা দিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হচ্ছে। মনে কোনো সুখ নেই। কাজকর্ম করতে পারেন না। বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই তাঁর। বাদশাহ বুঝলেন, মৃত্যু তাঁর দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে।দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসকেরা এলেন। নানা রকমের ওষুধ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোনো উপকার হয় না।

সবাই খুব চিন্তিত।

চিকিৎসক এলেন ইরান-তুরান থেকে। চিকিৎসক এলেন কাবুল-কান্দাহার থেকে। শেষে এক চিকিৎসক এলেন গ্রিস থেকে।

গ্রিসের চিকিৎসক বেশ কয়েক দিন ধরে সব ধরনের পরীক্ষা করলেন বাদশাহকে। নাড়ি টিপে দেখলেন। শরীরের তাপ নিলেন। তারপর তিনি বললেন, এ বড় কঠিন অসুখ। তবে এর চিকিৎসা আছে। একজন অল্পবয়স্ক বালক প্রয়োজন, যার হৃৎপিণ্ড থেকে ওষুধ তৈরি করতে হবে। সেই ওষুধে বাদশাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

বাদশাহর অসুখ। প্রয়োজন অল্পবয়স্ক বালক। দিকে-দিকে লোক ছড়িয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে একটা ছেলেকে পাওয়া গেল। ছেলের বাবা টাকার বিনিময়ে খুব অনায়াসে ছেলেটিকে বিক্রি করে দিল বাদশাহর লোকদের কাছে। টাকাও পেল বিপুল পরিমাণ।

কাজি বিচারসভায় রায় দিলেন, এই ছেলের জীবন বধ করা অন্যায় কোনো কাজ নয়। কারণ, এই ছেলের তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে বাদশাহর মূল্যবান জীবন রক্ষা পাবে।

ছেলেটি এসব ঘটনা দেখে আর সারাক্ষণ মিটিমিটি হাসে। জল্লাদ তাকে হত্যা করার জন্য ধরে-বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমিতে। তার হৃৎপিণ্ড থেকে তৈরি হবে ওষুধ। ছেলেটি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল। বাদশাহ পেছনে ছিলেন। ছেলেটির হাসির শব্দ শুনে তিনি খুব বিচলিত হলেন। একটু পরেই তার মৃত্যু হবে! মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তার সুন্দর দেহ। তা হলে ছেলেটি প্রাণ খুলে হাসে কেন? বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন।

তুমি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এ রকমভাবে হাসছ কেন?

ছেলেটি হাসতে-হাসতেই বলল, হায়, আমার জীবন! আমি হাসব না তো কে হাসবে বলুন? পিতামাতার দায়িত্ব সন্তানদের রক্ষা করা। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে আমার বাবা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কাজির দরবারে মানুষ যায় কেন? সুবিচারের আশা নিয়ে। কিন্তু কাজি সাহেব অন্যায়ভাবে বাদশাহর পক্ষ নিলেন। আমাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আর বাদশাহর কর্তব্য কী? বাদশাহ তো গরিব-দুঃখী, অত্যাচারিত, নিপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করবেন। কিন্তু এখন কী ঘটতে যাচ্ছে আমার জীবনে? বাদশাহ নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য অন্যের জীবনকে তুচ্ছ করছেন। কিন্তু অপরের জীবনও যে তাঁর নিজের কাছে অতি মূল্যবান এই সামান্য কথা তিনি মনেই রাখলেন না। হায়! একটু পরেই আমার মৃত্যু হবে। আমি হাসব না তো কে হাসবে! জগৎ-সংসারের এসব খেলা দেখে একমাত্র আমিই প্রাণ খুলে হাসতে পারি।

বাদশাহ এই কথা শুনে অবাক হলেন। ছেলেটির প্রতি অসীম মমতায় তিনি কাতর হয়ে উঠলেন। তিনি ছেলেটিকে মুক্ত করে দিলেন।

আর আশ্চর্যের ব্যাপার। তার কিছুদিন পরেই বাদশাহর অসুখ সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

লেখক-পরিচিতি

১৯৬৪ সালের ৭ই এপ্রিল আমীরুল ইসলাম ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আনজিরা খাতুন এবং পিতার নাম সাইফুর রহমান। তিনি ঢাকার ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল থেকে ১৯৭৯ সালে এসএসসি এবং ১৯৮১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক।

আমীরুল ইসলাম একাধারে ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর রচিত ছড়াগ্রন্থগুলোর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য 'খামখেয়ালি' (১৯৮৪), 'যাচ্ছেতাই' (১৯৮৭), 'রাজাকারের ছড়া' (১৯৯০), 'আমার ছড়া' (১৯৯২), 'বিলাই' (১৯৯৭), 'বীর বাঙালির ছড়া' (১৯৯৭), 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' (১৯৯৭)। ছোটদের জন্য রচিত গল্পগ্রন্থগুলো হলো : 'আমি সাতটা' (১৯৮৫), 'এক যে ছিল' (১৯৮৬), 'দশ রকম দশটা' (১৯৮৯), 'সার্কাসের বাঘ' (১৯৮৯), 'ভূত এল শহরে' (১৯৯২), 'আমি ওয়ান আমি টু' (১৯৯২), 'আমি একদিন পিঁপড়ে হয়ে গিয়েছিলাম' (১৯৯৭), 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর গল্প' (১৯৯৭)। ছোটদের জন্য বেশ কয়েকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। 'অচিন যাদুঘর' (১৯৮৫), 'আমাদের গোয়েন্দাগিরি' (১৯৯২), 'রূপঝুমপুর' (১৯৯২), 'একাত্তরের মিছিল' (১৯৭১) ইত্যাদি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আছে কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থ ও বিদেশি রূপকথার গল্প।

শিশুসাহিত্যে কৃতিত্বের জন্য তিনি ১৯৮৩ সালে সিকান্দার আবু জাফর শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৮৪, ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার এবং ২০০৭ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

সার-সংক্ষেপ

কোনো এক বাদশাহর অসুখ। রাজ্যের সেরা ডাক্তার-কবিরাজ তাঁকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হন। ইরান-তুরান, কাবুল-কান্দাহার থেকে ডাক্তার এসেও তাঁকে রোগমুক্ত করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত গ্রিসের চিকিৎসক জানান, অল্পবয়স্ক বালকের হৃৎপিণ্ড দিয়ে তৈরি ওষুধেই কেবল বাদশাহ সুস্থ হতে পারেন।

এক পিতা টাকার বিনিময়ে তার ছেলেকে বিক্রি করে দেয়। কাজি রায় দেন যে, কিশোরের জীবন থেকে রাজার জীবন যেহেতু অনেক মূল্যবান, তাই তার তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে রাজার জীবন রক্ষা করা অন্যায় হবে না। যখন তাকে হত্যার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন রাজা লক্ষ করেন, ছেলেটি প্রাণভরে হাসছে। রাজা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, তার জীবনটাই তো হাসির। পিতা টাকার জন্য তাকে বিক্রি করে দেয়, কাজি তার হত্যার পক্ষে রায় দেন আর বাদশাহ তার জীবন রক্ষা না করে তাকে হত্যার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে। বাদশাহ তার কথা শুনে মমতায় কাতর হয়ে পড়েন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। কিছুদিন পর বাদশাহও সুস্থ হয়ে উঠেন।

শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষীণ – সরু, চিকন, নিচু, অস্পষ্ট। **হানা** – আক্রমণ করা। **ইরান** – মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ, পারস্য। **কাবুল** – আফগানিস্তানের রাজধানী। **কান্দাহার** – আফগানিস্তানের একটি শহর। **গ্রিস** – ইউরোপ মহাদেশের একটি দেশ। প্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য বিখ্যাত। **নাড়ি** -ধমনি স্পন্দন, শিরা- উপশিরা। **শরীরে তাপ** – জ্বর অর্থে শরীরের উষ্ণতা। **দিকে-দিকে** – চারদিকে। **বধ** - হত্যা করা। **জল্লাদ** – মৃত্যু-দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যু যে কার্যকর করে। **বধ্যভূমি** – যেখানে মানুষ হত্যা করা হয়। **কাজি** – বিচারক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দেশের চিকিৎক ঔষুধ তৈরির কথা বললেন?

ক. গ্রিস খ. নিজ দেশ
গ. ইরান-তুরান ঘ. কাবুল-কান্দাহার

২. কী দিয়ে তৈরি হবে বাদশাহর ওষুধ?

ক. নাড়ি টেপা দিয়ে খ. শরীরের তাপ দিয়ে
গ. ছেলেকে হত্যার মধ্য দিয়ে ঘ. হৃৎপিন্ড দিয়ে

৩. চিকিৎসক এলেন-

i. কাবুল-কান্দাহার থেকে
ii. ইরান-তুরান থেকে
iii. গ্রিস থেকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাজামশাই তার শখের বাগানের জন্য দরিদ্র উপেনের চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটিসহ দুই বিঘা জমি জবরদখল করে নিলেন। উপেন মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

৪. 'বিচার নেই' গল্পের বাদশাহ আর উদ্দীপকে রাজামশাই কোন দৃষ্টিতে একই মানসিকতার?

ক. চরম স্বার্থপর খ. পরহিতব্রতী
গ. পরোপকারী ঘ. কল্যাণকামী।

সৃজনশীল প্রশ্ন

পাকিস্তানিরা এদেশের সম্পদ লুট করে নিয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে জেলে ভরেছে। দাবি আদায় করতে গেলে গুলি মেরেছে। আর স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে গেলে তাদের অন্যায়ের সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে এদেশের কিছু মানুষ আর কিছু বিদেশি রাষ্ট্র। এই ইতিহাস পড়ে রাগে আর ঘৃণায় রি রি করে ওঠে দীপ্রর শরীর।

ক. বাদশাহর কর্তব্য কী?
খ. ছেলেটি প্রাণ খুলে হাসে কেন?
গ. উদ্দীপকের পাকিস্তানিদের আর 'বিচার নেই' গল্পে বাদশাহর আচরণের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. দীপ্র 'বিচার নেই' গল্পের ছেলেটির মতো প্রতিবাদী হয়ে ওঠতে পারেনি- এ মন্তব্যের ওপর তোমার মতামত দাও।

চরু

হাসান আজিজুল হক

বনের একধারে আপনমনে ঘাস খাচ্ছিল চরু। চরু এক হরিণছানার নাম। বিকট একটা শব্দে চমকে উঠে সে মুখ তুলে দেখল বনের একটু উঁচুতে ঝোপের পাশ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। আশপাশে মা নেই। মা তো তার পাশেই ছিল। চরু মায়ের এক ছেলে, বয়স দুই মাসও হয়নি। সকালে মায়ের সঙ্গো বের হলেই মা তাকে বকে। কেন সে ঐ রকম তিড়িং বিড়িং লাফায়! কেন সে মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়! সে কি জানে না বনে হালুম আছে। হালুম যে তার মতো হরিণের বাচ্চা এক গেরাসে খেয়ে নেবে। এই রকম করে কেবলই ধমকায় তাকে তার মা। সেই মা এখন কোথায় গেল! চরু এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে, গেল কোথায় তার মা? বনের বাইরে এখানটা একটুখানি ঢালু। ঢালুর পরে নোনা পানির খাল। ঢালু জমিতে সবুজ ঘন ঘাস। সেই ঘাস চরু খায় আর ভাবে, সারা জীবনে এত ঘাস সে খেয়ে শেষ করতে পারবে না, আর এই ঘাস ছাড়া সে আর কিছু খাবেও না।

মাকে কোথাও দেখতে পেল না চরু, তখনই ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গো একটা পোড়া গন্ধ নাকে এল তার। সেই গন্ধ ধরে সে পায়ে পায়ে ঢালু ঘাসজমিটা পেরিয়ে বনের ধারে চলে এল। তারপর হালকা পায়ে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে ঝোপের কাছে গিয়ে উঁকি দিতেই দেখতে পেল মা তার নিথর হয়ে শুয়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে চরু মাকে শুকতে লাগল। সেই পোড়া গন্ধটা নাকে এল। আর এল রক্তের গন্ধ। মায়ের বুকের কাছে বড় একটা ফুটো। ফুটো দিয়ে রক্ত এখনো চুঁইয়ে পড়ছে। মায়ের চোখ খোলা। কেমন একটা নীলচে রং চোখটায়। চরু মাথা দিয়ে মাকে ঠেলতে লাগল, মায়ের মুখে মুখ ঘষতে লাগল। মনে মনে বলল, কেমন মেয়ে তুই, এত সকালে কেউ

শুয়ে থাকে। চবু একবার মায়ের মুখের কাছে যাচ্ছে, একবার পায়ের কাছে যাচ্ছে- এ সময় ঝপাং করে একটা দড়ির জাল এসে পড়ল চবুর ওপর। গায়ে জাল জড়িয়ে ধরে তাকে। হাতে-পায়ে, ঘাড়ে-মাথায় জাল জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মাটিতে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল চবু। তার কানে এল এক দজ্জাল মানুষের খি খি হাসি। তারা এগিয়ে এসে দুজনে মিলে কাঁধে নিল তার মরা মাটাকে। একজন এসে জালসুদ্ধ ঘাড়ে তুলল তাকে। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। সে আর কিছু জানে না।

খাল পেরিয়ে গাঁয়ের মধ্যে এক গেরস্ত বাড়িতে এল চবু। জাল থেকে বের করে সবু দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো তাকে। বাড়ির একটা ফর্সা ন্যাংটা ছেলে এসে তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল, আর ততক্ষণে দুজন লোক মিলে তার মায়ের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল। তারপর ছোট ছোট টুকরো করে একটা ঝুড়ি ভরে ফেলল তার মাংসে। খানিক ক্ষণের মধ্যেই চবুর চোখের সামনেই তার মা যেন উবে গেল। শুধু পড়ে রইল বাদামির ওপর সাদা ছিটেঅলা চামড়াটা আর দুটো নীল চোখঅলা শিংসুদ্ধ মাথাটা। মাংস ভরা ঝুড়িটা নিয়ে একজন গাঁয়ের ভেতর চলে গেল বিক্রি করতে। সেদিকে চেয়ে রইল চবু। আর চবুর দিকে চেয়ে রইল তার মায়ের মুণ্ডুর দুই খোলা নীল চোখ।

এই খারাপ বাড়িটায় চবু দিন দুই কিছুই খায় না। আর খাবেই বা কিসে? মায়ের দুধ খেত চবু। এখন তাকে কে দুধ দেবে? ফরসা ন্যাংটা ছেলেটা তার জন্য কচি ঘাস, কেওড়ার পাতা এসব আনতে লাগল, আর তার মুখে গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করল নরম ঘাস, টক কেওড়ার পাতা। দুদিন পর চবু আর কিছুতেই বাঁচে না, চোখে কিছু দেখতে পায় না, কানে কিছু শুনতে পায় না। তখন বাড়ির লোকেরা বলল, ছানাটা যদি মরেই গেল তাহলে আমাদের আর লাভ হলো কী? ওর মা'টার মাংস বেচে দুই পয়সা হয়েছে,এর মাংস তো এখনো বেচার মতো হয়নি। ছানাটাকে খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে তুলতে পারলে তবে কিছু পাওয়া যাবে। এসব কথা বলতে বলতে তারা গরুর দুধ নিয়ে এল বোতলে ভরে চবুর জন্য। বোতল থেকে চবু দুধ খেল, ঠিক যেন মায়ের দুধ খাচ্ছে। চবু একটু একটু করে সেরে উঠল।

ফরসা ন্যাংটা ছেলেটা সব সময়ে তার পেছনে লেগে আছে। ছেলেটা ট্যারা, মুখ দিয়ে সব সময় লালা গড়ায়। কেউ তাকে পেছন থেকে কথা বললে সে কিছুই শুনতে পায় না। গাঁয়ের মাঠে চবুকে নিয়ে গিয়ে দড়ি খুলে তাকে ছেড়ে দিল সে। চবুর আর একবারও মায়ের কথা মনে পড়ল না, সে খেলতে লাগল ফরসা ছেলেটার সঙ্গে। তার ন্যাংটা কোমরে ঘুনসিতে একটা ঘুঙুর বাঁধা। চবুর সঙ্গে যখন সে দৌড়ায়, ঠুনঠুন করে তার ঘুঙুরের শব্দ হয়।

ন্যাংটা ছেলেটা এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে গলায় চুমু খায়।

এমনি করে কত দিন কেটে গেল। দুবার আমগাছে মুকুল এল। চবুর গায়ের ফ্যাকাশে সাদা রং বদলে গিয়ে তার জায়গায় ঘন বাদামি রং দেখা দিল, আর দেখা দিল সাদা সাদা বুটি। একজোড়া ডালপালাঅলা শিং গজালো মাথায়। ফরসা ছেলেটাও এখন একটু বড় হয়েছে, সে আর ন্যাংটা থাকে না, একটা প্যান্ট পরে শুধু। বাড়ির বাবরি চুল হিংসুটে চোখঅলা লোকটা আবার একদিন বিরাট একটা হরিণ কাঁধে নিয়ে বাড়ি এল। এত বড় হরিণ, তাকে বয়ে আনতে লোকটার শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। তার পিঠ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হরিণটার মাংসের টুকরোয় দুটো ঝুড়ি ভর্তি হয়ে গেল। বাড়ির একজন এসে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, মাংস কতটা হবে? বাবরি চুল লোকটা বলল, মণখানেক হতি পারে। অন্য লোকটা বলল, দশ টাকা স্যারের নিচে বেচা যাবে না।

দুজনে মাংসের ঝুড়ি দুটো মাথায় নিয়ে গাঁয়ের ভেতরে চলে গেল। পড়ে রইল হরিণটার বিরাট চামড়া আর তার শিংঅলা মুণ্ডুর দুটি নীল চোখের স্থির চাউনি।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক দিন পর এক সন্ধ্যের সময় বাড়ির সবচেয়ে বড় ভাই রোগা চিমসে লোভী লোকটা বলল, বাড়ির হরিণটাকে আর রেখে লাভ কী হবে। শুধু শুধু খাওয়ানো খালি। আর যেরকম শিং হইছে, কোন দিন কাকে খুন করবে। ওর মাংস কতটা হতি পারে? বাবরিচুল লোকটা বলল, মণ দেড়েক হতি পারে।

তালি কাল ওটাকে জবাই দিয়ে দে।

সকাল হচ্ছে। দাওয়ায় ঘেরা জায়গাটার ভেতর চরু এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সকালের আলো আসতেই সে উঠে বসল। এক কোণে কালকের খানিকটা ঘাস ছিল। সে ঘাস চিবোতে লাগল চরু। দেখতে দেখতে বেড়ার ফুটো দিয়ে এই রকম চুলের মতো সরু সরু সূর্যের আলোর সুতো ঢুকে পড়ল চরুর অন্ধকারে ঘরের মধ্যে। তখুনি তার কানে এল বালিতে ছুরির ফলা ঘষার ঘষ ঘষ আওয়াজ। তারই জন্য ছুরি শানানো হচ্ছে। চরু জানে না তার মাংস মানুষের কত প্রিয়!

আপনমনে ঘাস চিবোতে চিবোতে হঠাৎ সে দেখতে পেল দাওয়ার বাইরের দিকের বেড়া একটু একটু করে ফাঁক হচ্ছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল বেড়াটা আর ঘরে ঢুকল ফরসা বোবা-কালা ছেলেটা। আঁকড়ে ধরল সে চরুর গলা, আর হু হু করে কাঁদতে লাগল। কিন্তু দেরি করল না সে, খুঁটিতে বাঁধা চরুর দড়িটা খুলে হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে চরুকে নিয়ে সে ভাঙা বেড়ার তলা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর ছুট, ছুট! চরুর তো মজাই ! লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে গাঁয়ের বাড়িঘর পার হয়ে ওরা এসে পড়ল খালের ধারে। সেখানে একটা ছোট্ট নৌকা বাঁধা। ছেলেটা চরুকে ঠেলে সেই নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে বসল। তার পরেই ছেড়ে দিল নৌকা।

খালের মাঝ বরাবর এসেছে, এইসময় পেছনে বহু লোকের পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। মানুষের একটা দল ছুটে আসছে। সবার আগে ছুটে আসছে বাবরি চুলঅলা হিংসুটে লোকটা। হাতে ছুরি। ছুরির ফলাটা সকালের আলোয় ঝকঝক করছে। তার পেছনে হায় হায় করতে করতে আসছে বাড়ির বড়ভাই রোগা চিমসে লোকটা। সবাই চিৎকার করে ডাকছে ছেলেটাকে, তাকে ফিরে আসতে বলছে চরুকে নিয়ে। এদিকে ছেলেটা বসে আছে ওদের দিকে পেছন ফিরে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না সে। শুনতেও পাচ্ছে না কোনো কথা। খালের ওপারে পৌঁছে গেল নৌকা। ঠিক সেইখানে, যেখানে চরু একদিন সকালে ঘাস খাচ্ছিল আর মরা মাকে দেখতে পেয়েছিল ঝোপের ধারে। যেখান থেকে জালে করে বেঁধে এনেছিল তাকে। নৌকা থামতেই ছেলেটা কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে দড়িতে টান দিয়ে চরুকে নামাল। সূর্যের আলো পড়েছে ছেলেটার মুখে। চরুর গলাটা জড়িয়ে ধরল সে, অনেকবার চুমু খেল তার গলায়। নাকের সর্দিমেশা চোখের পানি মুছল তার ঘাড়ের লোমে, তারপর গলা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে উস্ উস্ করে বিকট আওয়াজ বের করল গলা থেকে।

একটা লাফ দিয়ে চরু উঠে গেল ঢালু ঘাসজমিটায়। একবার ফিরে তাকাল সে। ছেলেটার কদাকার ভেজা মুখে আলো পড়েছে। একটু একটু করে হাসি ফুটে উঠল সেই মুখে। তখন কী সুন্দর দেখাচ্ছে সেই মুখ!

চরু আর ফিরে দেখল না। বড় বড় লাফ দিয়ে সে জঙ্গালের আড়ালে চলে গেল।

[ঈষৎ সংক্ষেপিত]

লেখক-পরিচিতি

হাসান আজিজুল হক দেশের বিশিষ্ট গল্পকার। দীর্ঘকাল তিনি বিভিন্ন কলেজে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বহু গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'জীবন ঘষে আগুন', 'নামহীন গোত্রহীন' 'পাতালে হাসপাতালে' ইত্যাদি। শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: 'ফুটবল থেকে সাবধান', 'লালঘোড়া আমি'। সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর জন্ম ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে।

পাঠ-পরিচিতি

গল্পটি একটি হরিণ ছানাকে নিয়ে। লোভী মানুষের বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় মা-হরিণ। তাদের জালে ধরা পড়ে হরিণছানা চরু। লোভী মানুষেরা নিহত হরিণ ও হরিণ ছানাকে নিয়ে আসে নিজেদের বাড়িতে। তারা মা হরিণের মাংস বেচে। খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি বলে হরিণছানা রক্ষা পায়। তারা তাকে পালতে থাকে নিজেদের বাড়িতে- বড়সড় হওয়ার জন্য। হরিণছানার খেলার সাথি হয় বাড়ির বোবা-কালা শিশুটি। হরিণছানা বড় হতে থাকে। শিশুটিও বড় হয়। একসময় বাড়ির লোকেরা ঠিক করে হরিণটিকে জবাই করে তার মাংস বাজারে বেচবে। কিন্তু তাদের ইচ্ছেয় বাদ সাধে বোবা-কালা ছেলেটি। সে হরিণটিকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করে। তাকে প্রাণে বাঁচায়। তার বুদ্ধিতে বনের হরিণ বনে ফিরে যায়।

এ গল্পে লোভী মানুষের হিংস্রতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কিশোর বালক। বনের পশুর প্রতি মমতায় সে হয়েছে প্রতিবাদী।

শব্দার্থ ও টীকা

বিকট– অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর। হালুম– বাঘের ডাক। এখানে বাঘ অর্থে ব্যবহৃত। গেরাসে– খাবারের দলা বা লোকমা। নিথর– সাড়াশব্দ বা নড়াচড়া নেই এমন। দঙ্গাল– দল; পাল। গেরস্ত– গৃহস্থ শব্দের কথ্য রূপ। সংসারি মানুষ। কেওড়া– কেয়াগাছ। ঘুনসি– কোমরে বাঁধার সুতো। শিরদাঁড়া– মেরুদন্ড; শরীরের পেছনের অংশে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত হাড়ের গ্রন্থি। হিংসুটে– হিংসা বা ঈর্ষা করে এমন; হিংসুক।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হরিণ শিকার করে কে?

ক. রোগা চিম্‌সে লোভী লোকটি
খ. বাবরি চুলঅলা হিংসুটে লোকটি
গ. এক দঙ্গল মানুষ
ঘ. ফরসা ন্যাংটা ছেলে

২. চরুকে খেতে দিল-

i. নরম ঘাস
ii. কেওড়ার পাতা
iii. গরুর দুধ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. চরুর মাংস কতটা হতে পারে?

ক. আধা মণ
খ. এক মণ
গ. দেড় মণ
ঘ. দুই মণ

নিচের উদ্দীপক পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

লোভী মানুষের হাতে জবাই হওয়ার আগেই খরগোশগুলোকে বনে পালিয়ে যেতে দেয় অপূর্ব। তারপর সবাইকে প্রাণী রক্ষার ব্যাপারে সচেতন করে তুলে সে।

৪. অপূর্বর মত 'চরু' গল্পের ছেলেটিও প্রতিবাদী হয়েছে-

i. লোভী মানুষের বিরুদ্ধে
ii. হিংস্রতার বিরুদ্ধে
iii. অত্যাচারের বিরুদ্ধে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

বাজার থেকে দুধ খাওয়ার জন্য গাইগরু কিনেছিল রহিমুদ্দিন। যখন বাছুর হলো তখন তা হয়ে গেল তার ছোট্ট ছেলে অন্তুর খেলার সাথী। কিন্তু অভাবে পড়ে রহিমুদ্দিন একদিন গাইটাকে বাছুরসহ বিক্রি করে দিতে চাইল। বাছুরের গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিল অন্তু। রহিমুদ্দিনের চোখেও পানি চলে এলো।

ক. রোগা চিম্‌সে লোভী লোকটা কে?

খ. 'তখন কী সুন্দর দেখাচ্ছে সেই মুখ'- কেন?

গ. 'চরু' গল্পের বাবরি চুলঅলা হিংসুটে লোকের সাথে উদ্দীপকের রহিমুদ্দিনের পার্থক্য কোথায় তা নির্দেশ কর।

ঘ. 'ফরসা বোবা-কালা ছেলেটি অন্তুর চেয়েও প্রতিবাদী'- বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০১৮
শিক্ষাবর্ষ
৭–আনন্দপাঠ

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য